সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুস্ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৫৪

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা]　　[মফঃস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

চতুস্ত্রিংশ ভাগের সূচী

—:•:—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দীন চণ্ডীদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

[৩৬২ পত্র]

তথা রাগ

বিচিত্র আসনে বসিলা সুন্দরী
রাধার মন্দির ঘরে।
বিনোদিনী রাই কহেন তাহাই
অধিক আদর করে॥
বিয়োগী দেখিয়া নবীন কিশোরী
বিবিধ মিঠাই আনি।
শাকরই ক্ষীর ঝুনা নারিকেল
চিনি চাঁপাকলা ফেনী॥
আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
যোগাই তাহার কাছে।
পুন পুন কহে এ[ ]প বদনে
তবে বহু সুখ আছে॥
হাসিয়া রমণী কুলের কামিনী
কহেন উত্তর বাণী।
এ সব মিষ্টান্ন দুজনে পাইব
একেলা না লব আমি॥
এ কথা শুনিয়া বৃকভানুসুতা
হাসিয়া হাসিয়া বলে।
তোমার আদর পরম যতনে
শাস্ত্রের লিখন-সারে॥
অভ্যাগত আগে পূজন যজন
এই যে মানিয়ে ভালে।
হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া
সকল জনাতে বলে॥
কহেন উত্তর হইয়া…………
সেই সেও নবরামা।
আগে আস্থ শয়ে করি আলিঙ্গন
জানিব তোমার প্রেমা॥
চণ্ডীদাস বলে অপরূপ দেখ
অসীমা যাহার লীলা।
দুঁহে পরস্পর একুই সমসর
বাহু পসারিয়া নিলা॥ ১০৪৬॥

[৩৬৩ পত্র আরম্ভ]

রাগশ্রী

রাধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সরে
আলিঙ্গন করে নব রামা।
শ্রীঅঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই
জানল পরশরস প্রেমা॥
কপট করিয়া ছলা জানিল ( ) কালা
জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে।
জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তনু
আপনা আপনি ভালবাসে॥

উঘাড়িয়া প্রেমরস আপনি পায়ল রস
ঐছন কপট রস লেহ।
হাসি সুধামুখী রাই পিয়ার বদন চাই
তোমার চরিত বড়ি এহ॥
বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ
এ সব বাখিয়া আইলে কোথা।
ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে লোটন কেশ
কেমতে আইলে তুমি এথা॥
হাসিয়া কহেন হরি শুনহ কিশোরী গুরি
তোমার বচন নহে আন।
তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান॥
নিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে
কত সুখ কহনে না যায়।
শূন্য মন্দির ঘরে দুজনে বেহার করে
দণ্ডীদাস দুহুঁ গুণ গায়॥ ১০৪৭॥

রাগ সুহই

আনন্দে নাহিক ওর।
কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি
সুখের নাহিক ওর॥
ফেরাফিরি বাহু চান্দে যেন রাহু
গিলল গগন মাঝে।
তৈছন পীরিতি করত এ রতি
রণরতি দুহে বাজে॥
যেমন শশক সোঁসর কিশোরী
সিংহের সমান কান।
শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ
সে জন কি জিয়ে টান॥
রতি রণ কাজে মন্দির সমাঝে
রতন-শেযের পরে।
দুহুঁ দুহাঁ সুখ বাঢ়ল আনন্দ
বিরল মন্দির ঘরে॥
হুঁহুঁ সে শবদ রসের আমোদ
উথলে রসের ঢেউ।
সহিতে নারয়ে রসের গরিমা
পরাণ কাড়িয়া লেউ॥
এক সুখে কত সুখ উপজল
বাজিল দুজনে রণ।
সমর জিনিতে নাহিক শকতি
বিনোদিনী কিছু কন॥
হে দে হে নাগর চতুর শেখর
পঙ্কজ কি সয়ে টান।
অলির দংশনে পঙ্কজ কম্পিত
দীন চণ্ডিদাস গান॥ ১০৪৮॥

রাগ কানড়া

উঠহ নাগর রায়।
দিবস গমন এ নহে করণ
কহিয়ে তোমার পায়॥
তেজহ সমর শুন সুনাগর
আর সে উচিত নয়ে।
শাশুরী ননদী আসি দেখে যদি
এই আছে মনে ভয়ে॥
জানি বা দেখয়ে পাড়ার পড়শী
বিষম লোকের কথা।
তুরিতে গমনে চলি যাহ তুমি
রহিতে [নার]য়ে এথা॥
যেমতে আইলে ধরি নারীবেশ
ঐছন চলিয়া যাহ।
শীতের বসন ভুঠল টানি…
………কাথোত্তে লহ॥

এ বোল শুনিয়া　　নাগর চতুর
কলসী লইয়া কাখে ।
বাহির হইল　　আয়ল···

[৩৬৪ পত্র আরম্ভ]

···গত ভরিয়া দেখে ॥
কেহো গোপরামা　　উলটিয়া চাহে
একলা যুবতী যায় ।
গোকুলের নহে　　কন গোপ রী···
···য়া নয়নে চায় ॥
কাহার ঘরণী　　রূপের তরণী
আয়ল মন্দির হতে ।
কখন না দেখি　　এ পথে আসিতে
বিসম লাগিল চিতে ॥
করে কানাকানি　　বরজ রমণী
এ জন কাহার মায়া ।
[চণ্ডীদাস বলে]　　চিনিতে নারিবে
কে যায় এ পথে বায়্যা ॥ ১০৪৯ ॥

শুনিতে সুস্বর　　মুরুলীর রব
শ্রবণ পাতল তায় ॥
তরুয়া কদম্বে　　দাণ্ডাই ত্রিভঙ্গে
রসিক নাগর কান ।
গৃহ কাজে নাহি　　গমন মনোহর
শুনিতে শুনয়ে আন ॥
শ্রবণ ভরিয়া　　মন মজাইয়া
শুনল বাঁশীর গীত ।
গৃহে কাজ মোর　　ছারখারে জাউ
ইহাতে লাগল চিত ॥
কেমন বাঁশীর　　গীত আলাপনে
শ্রবণে পশিল যবে ।
কি জানি কঠিন　　এ পাপ [প]রাণ
ধৈরজ না রহে তবে ॥
বৈঠল কিশোরী　　সব পরিহরি
গৃহকাজ রহে দূরে ।
শ্রবণ পরশি　　শুনি সেই বাঁশী
চণ্ডীদাস মন ঝুরে ॥ ১০৫০ ॥

রাগ নটনারায়ণ

নিজ বেশ ছাড়ি　　রসিক মুরারি
বান্ধল বিনোদ চূড়া ।
নানা আভরণ　　অঙ্গের ভূষণ
নানা মালতির বেঢ়া ॥
কনক বলয়া　　নানা রত্ন মণি
মাণিক তাহার মাঝে ।
বিনোদ নাগর　　বিনোদ বেশেতে
নানা অভরণ সাজে ॥
মোহন মুরুলী　　ধরিয়া করেতে
বাজই নাগর রায় ।

রাগ গড়া

আন ছলা করি জলেরে যাই ।
সো নব কিশোরী বরজ রাই ॥
কনক গাগরি লইয়া কাঁখে ।
ঐছন চলল যমুনা মুখে ॥
চলিতে না পারে সুখের সরে ।
যেন রসভরে খসিয়া পড়ে ॥
পুলক ন মানল সকল তনু ।
উথলি উথলি চলত দুহু ॥
হেরল নাগর তরুয়া মূলে ।
দুহে দুহা ভেল কটাক্ষ হেলে ॥

বঙ্কিম নয়নে নয়নে মেল।
রস-পর-কথা দুজনে ভেল॥
সঙ্কেত করল কদম্ব বনে।
এখানে থাকিব মনের সনে॥
ঐছন যুগতি করিয়া সারা।
নারীবেশ ধর তেমতি পারা॥
লইবে কটোরা পুরিত করি।
তৈল হলদি লইবে হরি॥
গুপতে গমন করিবে ভালে।
যেমত কো জন লখিতে নারে॥
এই সে সঙ্কেত করল রাই।
যমুনার জল লইয়া যাই॥
নবীন কিশোরী চলল ঘরে।
চণ্ডীদাস দেখে আখের পরে॥ ১০৫১॥

[৩৭৬ পত্র]

…র উপাসনা স্থান।

রাধানাম দুই বর্ণ কেবল আমার মর্ম্ম
তুমি সে রূপসী অনুপাম॥
তুমি নয়নের তারা তিলে কতবার হারা
কেবল পরাণ সমতুল।
দেখিলে জুড়ায় আঁখি নহে বা মরিয়া থাকি
তুমি সে আমার হ( ) মূল॥
তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর
এক মুখে কহিলে কি হয়।
তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস কয়॥ ১০৭৭॥

যতিশ্রী

বামেতে বসিলা রাই অতি অনুপাম।
নীলমণি বেঢ়ে যেন বিজুরির দাম॥
কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি।
মেঘ মাঝে উপি রহে যেমত দামিনী॥
বৃন্দাবন আলো করে দুহার ছটাতে।
দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে॥
বরজ রমণী তুমি কুসুম সুগন্ধ।
বাছিয়া বিছায় শেযে ঝরে মকরন্দ॥
নিজ নিজ কুটীর করয়ে ফুল সাজ।
মণিমন্দির শোভিছে তার মাঝ॥
বিচিত্র পালঙ্ক পরে সোনার তুলিচা।
সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ মালিচা॥
কুঙ্কুম চন্দন আর আতর গুলাল।
মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল॥
তথিপর গুতলি পুতলি নবগুরি।
আনন্দে বেহাররসে কিশোর কিশোরী॥
মাতল মদন রসে চতুর মুরারি।
মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি॥
ঐছন করল কেলি শ্যাম মধুকর।
পঙ্কজ পাইলে যেন পীরিতি ভ্রমর॥
তৈছন কুসুম (—)-কানু বসিয়া।
ব্রজবধূ রসে মধু পিবই মাতিয়া॥
……………নাগর ময় কান।
ঐছন পীরিতি দীন চণ্ডাদাস গান॥১০৭৮॥

কানড়া সুই

ঐছন পীরিতি করিয়া এ রীতি
নাগর রসিক বরে।
হরষ বদনে কহল বচনে
প্রেমের পীরিতি শরে॥

গুপথ পীরিতি করে নিতি নিতি
কেহ সে নাহিক জানে।
মধুর মঞ্জুরি কহে ....
পুরিয়া কার স্থানে ॥
গেলা নিশাপতি হইল বিহান
বহিতে উচিত নহে।
নব নব রামা তেজি গৃহ ধামা
যাইতে উচিত হয়ে ॥
গেলা চান্দ স্থানে হইল বিহানে
শুনহ নাগর কান।
হরষে বিদায় কর যদুরায়
ইহাতে না কর আন ॥
সভারে কহল হরষ বদনে
চলিতে গৃহের মাঝ।
এথা গোচারণে বালকের সনে
চলিলা নাগররাজ ॥
নিজ নিজ গৃহ করল পয়ান
যতেক ব্রজের রামা।
গুরুজনা কেহ নাহি জানে এহ
গুপথ রসের প্রেমা ॥
নিজ গৃহ কাজে চলযে সভাই
আপন গৃহের মাঝ।
কহে চণ্ডীদাস না হয় বেকত
জানল কি রীতি কাজ ॥ ১০৭৯॥

সুহই সিন্ধুড়া

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি ॥

[৩৯৮ পত্র]

.........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবৰ্ত্তনে
চুলাতে............ ।
তেজি আবর্ত্তন হইয়া বিমন
ঐছন গেলা সে চলি ॥
কেহো বা আছিল শিশু কোলে কবি
[মুখে] দিয়া তাঁর স্তন।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা ভ্রমে
বৃন্দাবন পানে মন ॥
কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে
অমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণ মুখী হয়া মুরুলি শুনিযা
সব বিসরিত ভেল ॥
কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিন্দ।
যেন কেহ আসি চোরাই লইল
মানসে কাটিয়া সিন্ধ ॥
চমকিত হয়া উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।
চণ্ডীদাসে কহে ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥

রাগ মঙ্গল

কোন সখী করে বেশে[র] বন্ধনে
পদ অভরণ করে।,
করের কঙ্কন নপুর বলিয়া
আপন চরণে পরে ॥

কেহো পরে এক নয়ানে অঞ্জন
কুণ্ডল পরল এক।
ভালের সিন্দুর চিবুকে পরল
দেখ হয় পরতেক ॥
গলে গজমতি হার মনোহর
পরিছে নিতম্ব মাঝে।
বাহু অভরণ যে ছিল ভূষণ
তাহাই করেতে সাজে ॥
ঐছন আপন বেশ পরিপাটি
করিয়া সকল জনে।
হরষ হইয়া রাধারে লইয়া
চলি যায় নিধুবনে ॥
সুস্বর শুনিয়া মুরুলির রব
অনুসর চলি যায়।
আস্ত আস্ত বলি সঙ্কেত বলিয়া
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥
প্রেমভরে যত আহির রমণী
গলিছে নয়নধারা।
অঙ্গ প্রফুল্লিত গদগদ স্বরে
পাইয়া প্রেমরস-সারা ॥
যা করে তা করু গৃহে গুরুজনা
নাহিক তাহার ভয়।
পরিবাদ মালা গলায়ে পরেছি
রসময়ী ইহা কয় ॥
নিজ পতি তেজি চলি[ল] গোপিনী
নাহিক কিসের ভয়।
কৃষ্ণমুখী হয়া বৃন্দাবন-পুরে
চলি যায়ে অতিশয় ॥
রাই মাঝে করি যায় যত গোপী
গাইছে কানুর গুণে।
বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
কিছুই নাহিক মনে ॥
ঐছন চলল বরজ রমণী
বৃন্দাবন পানে দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে উৰ্দ্ধমুখী সভে
যাইছে হরষ হয়া ॥ ১০৮৩ ॥

সুই সিন্ধুড়া

প্রবেশিল যত আহীর রমণী
গভীর বনের মাঝে।
নিধুবনে বসি নাগর হরষি
নটবর বেশে সাজে ॥
চম্পকলতা তাহে আগে হয়া কহে
নাগর কাছেতে গিয়া।
কহেন সকল রাধার গমন
হরষিত কিছু হয়া ॥
কত দূরে রাই গমন মাধুরি
শুনি নাগর শুনি।

* * *

[৬৯০ পত্র]

স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥
তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ।
তবে মোর নাম…রঙ্গ ॥
এ কথা শুনিতে হরষ কানু।
পুলক হইল সকল তনু ॥
তাহারে হেরিতে ভৈগেলুঁ ভোর।
সুখের অবধি নাহিক ওর ॥
তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া।
বিথার হইল মাথার চূড়া ॥
নপুর পড়িল ধরণীতলে।
এ সব বচন কহিল তোরে ॥
চণ্ডীদাস বলে চরণতলে।
সুবল ইহার জানিল মূলে ॥ ১৮৬৯ ॥

ধানশী

হেদে হে সুবল সখা   আচম্বিতে দিল দেখা
    চিত্রের পুতলী হেন বাসি।
কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী   কনকপুতলি রঙ্গী
    মন্দ মধুর কৈল হাসি॥
সে কথা পড়িল মনে   আমার মরমে জানে
    কুটিল নয়ন কর বাঁকা।
দেখিতে তাহার রঙ্গ   অবশ করিল অঙ্গ
    শুন ভাই মরমের সখা॥
সে হইতে তনু মোব   মদনে হইল ভোর
    প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে।
তোমায় কহিল এহ   বিচার করিয়া কহ
    বেদনা কহিল তোর স্থানে॥
হাসিয়া সুবল কয়   শুন তুয়া রসময়
    রসিক নাগরি দিব আনি।
তবে সে আমার নাম   সুবল বলিয়া গান
    নিসন্দে জানিহ তুমি॥
কালিয়া নাগর কহে   সকলি কহিল তোরে
    মরম সরম সব কথা।
বুঝিয়া যে কর তুমি   কি আর বলিব আমি
    বড়ই হইল হিয়ার বেথা॥
ভাল ভাল বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে
    চল ভাই নিজ ঘরে যাই।
সুবল সংহতি যাই   নন্দের মন্দিরে আই
    দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই॥ ১৮৬২॥

—

তুড়ি রাগ

কহেন সুবল তবে মধুর বচন।
ইহার বিচার ভাই কহিব এখন॥
নিভৃতে বসিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি।
সুবল কহেন কিছু শুন যদুপতি॥
বৃষভানুপুরে যাব একটী বিচার।
মনে মনে কহে বাক্য রচিলা সুসার॥
যাইব তথায় যদি শুন বনমালি।
ইহার রচনা কিছু নিবেদন করি॥
ধরিব কনহু ছলা, হব পাটদার।
তবে বৃষভানুপুরে করিয়া সুসার॥
নানা অবতার লিখ মৎস্য কূর্ম্ম আদি।
বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধি॥
লিখিব বাউন...তি রাম।

[৬৯১ পত্র আরম্ভ]

ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম॥
শ্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা।
নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্ব্বথা॥
পশ্চাতে লিখিযে রূপ নবঘন শ্যাম।
চতুর মুরুলি ধরি বেশ অনুপাম॥
সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে।
পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিসে॥
এই তন্ত্র মন্ত্র করি বসাই রাধা।
ইহাতে অন্তথা নহে না করিব বাধা॥
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি।
চিত্রপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী॥
॥ ১৮৬৩॥

—

শ্রীনট

ভাল ভাল বলি   নাগর শেখর
    সুবল পানেতে চায়।
লিখ চিত্রপট   হইয়া নিকট
    মোর মনে হেন ভায়॥
আনিয়া কাগত   পট করি যুত
    যাহার উপমা নহে।

আনি তুলি কাঠি লিখিতে লাগল
অতি সে সুবল মোহে ॥
নানা অবতার মৎস্য কূর্ম্ম আদি
নানা তরু জীব করি।
নানা পক্ষগণ লিখিল তৈখন
তাহা কি কহিতে পারি ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আর নৃসিংহ অবতার
বরাহ মুরতি সারা।
বামন শ্রীরাম আর ভৃগুরাম
রোহিণীনন্দন পারা ॥
তিন রাম রূপ লিখিলা স্বরূপ
শ্রীনন্দ যশোদা আদি।
তরুলতা যত লিখিলা বেকত
আর সে যমুনা নদী ॥
নানা পক্ষগণ লেখিলা তৈছন
নানা জীব করি মেলা।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
আনন্দ রসের খেলা ॥ ১৮৬৪ ॥

ধানশ্রী

তবে আর পট লিখিলা নিকট
নবঘন শ্যাম রূপ।
দেখিতে কি দেখি পিছলয়ে আঁখি
আনন্দ রসের কূপ ॥
জলদ বরণ যেন নব ঘন
চরণে নপুর দিল।
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর
অতি সে উজর ভেল ॥
রতন নপুর চরণ উপর
সোনার বসন সাজে।
কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিঙ্কিণি
কলহংস পারা বাজে ॥
সুনাভি গভীর অতি সে মধুর
কুন্দ কন্দর শোভা।
কুঞ্জর সোসর কুম্ভ পরিসর
তৈছন দেখিতে আভা ॥
তাথে সুলেপন মলয় চন্দন
মৃগমদ তাথে সাজে।
সুগন্ধ পাইয়া অলিকুল যত
তাহাতে আসিয়া মজে ॥
সুবাহু গঠন সুবল মোহন
বলয়া বিরাজে ভাল।
কর দুটী যেন হিঙ্গুল সমান
দশ চান্দ শোভে তার ॥
...পদক করে চল টল
বনমালা শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল শোভিত
যেন দীন......

[৭১২ পত্র আরম্ভ]

.... দোহে সে পুলক
অতি সে আনন্দ পায়ে ॥
চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে ॥
সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বাড়ি।
চণ্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার
সুবল চরণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥

শ্রীরাগ

চলল যমুনা সিনান আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে॥
দেখিলে বনের দেবতা কৈছে।
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে॥
কেমন মুরুতি কহ না রাধে।
কত সুখ কৈলে মনের সাধে॥
কেমন দেবতা কোন বা স্থান।
কেমন মুরুতি কি তার নাম॥
রাধা কহে তবে সভার আগে।
শুনহ শ্রবণে ঐছন রাগে॥
পুজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে।
তিঁহ সে থাকেন বটের মূলে॥
.........মুরুতি কায়া।
দেখিতে না পাই কনহুঁ ছায়া॥
যখন পুজল নৈবেদ্য ফুলে।
.........ঘনে বুলে॥
শব্দ শুনিতে কাঁপল দেহ।
না দেখি মুরতি শব্দ এহ॥
.....................দেখি রূপ।
উঠিল লহরি ভয়ের কূপ॥
তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে।
...............যেমন টলে॥
...............মোর অঙ্গ তৈছন হয়।
বড়ই অন্তরে লাগল ভয়॥
বন...........কানে।
নাহিক মুরুতি কহিল মনে॥
কহে রসবতী সুন্দরী রাধা।
পূজ...সেখানে...করিয়া সাধা॥
একেলা গেলড়ি দেবের স্থানে।
তোমরা এখানে রহিলে কেনে॥
কহে সহচরী রাধার পাশে।
কহিলা সুবল আমার কাছে॥
আন জন গেলে দেবার ক্রোধ।
আমরা পাইল মনের বোধ॥
তেই সে না গেলুঁ তোমার সাথে।
আমরা রহিলুঁ এই সে পথে॥
হাসি রসবতী নবীন রাই।
দীন চণ্ডীদাস এ গুণ গাই॥ ১৯০৪॥

তুড়ি রাগ

সহচরী বলে ভালে শুন নব বামা।
না দেখ মুরুতি রতি বনচারী নামা॥
এ কথা শুনিয়া রাধা হাসিতে লাগল।
বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পাল্য॥
চলিলা যমুনা স্নানে সহচরী সনে।
স্নান করি রসবতি চলিলা ভবনে॥
নিজ নিকেতনে গুরী করিল পয়ান।
ভাবিতে লাগিলা সেই রূপের আখ্যান॥
নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া।
নব ঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া॥

[৭১৩ পত্র আরম্ভ]

হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল।
চিত্রপট কথা সকল কহিতে লাগিল॥
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে।
আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে॥
তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।
বহু মূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে॥
হে...মণি রত্ন কত খুঁজিলে সে পাই।
প্রাণ সমতুল বস্তু দিলে মোর ঠাই॥
কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া।

ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়া ॥
চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়।
পূর্ব্বরাগ সখা উক্তি এই রস কয় ॥ ১৯০৫॥

—

রাগ কাফি

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত।
কহ কহ মুনিবর আকর্ষিল চিত ॥
প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে।
গরুড় পুরাণ কথা শুনিলে তুরিতে ॥
যাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাথমাঝ ॥
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাজ।
অষ্টাদশ পুরাণ লেখা পাখের সমাঝ ॥
গরুড় পুরাণের কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত ॥
চারি পুরাণ যাটি সখা উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে ॥
সুবল মিলন আর পূর্ব্বকথা শুনি।
নানামত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি ॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন।
রাধিকার নাম তত্ত্ব পরম কথন ॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিলা গোপনে।
সাঁঠিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে ॥
এ ষট্‌সম্বাদ কথা [অ]পূর্ব্ব কথন।
পিক্ষ সনে শুক পক্ষ কহেন বচন ॥
পিক কহে শুনিলাঙ পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা উক্তি নবোঢ়ারস রতিগুণগাথা ॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমৃত বচন কথা শুনি একমনে ॥
শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণি।
যুগল মধুররস অমিয়ার খণি ॥
... ...
দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের খণি ॥ ১৯০৬ ॥

—

অথ বিপ্রলম্ভ

উল্লাস

সুই রাগ

এক দিন বসি নাগর রসিয়া
বসিয়া চাপার বনে।
কহে বিনোদিনী হরষ বদনী
চাহিয়া পিয়ার পানে ॥
আজু সে তোমার বেশ বনাযব
বসিয়া চাঁপার বনে।
তবে সে পুরব মনরথ কাম
শুনহ নাগর কানে ॥
তুলি বনফুল হার বনাওল
তুলব সুন্দরী রাই।
চন্দনের চাঁদ ভালে পরা...
পিয়ার বদনে চাই ॥
পুন শশধর কিবা সে শোভল
চাচর কুন্তল আটি।
পাটুআর ডোরী ......দোফেরী
বান্ধল সে পরিপাটি ॥
নানা ফুলদাম বেঢ়ি অনুপাম
এ গজ মুকুতা ছড়া।
দুসারি মালি.........

—

[৭৫০ পত্র আরম্ভ]

…শেষ নিশি দ্বিতীয় পহরে
দেখিল স্বপনে এই।
দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল
কাতরে চলিল সেই॥
তেজিল শয়ন কচালি নয়ন
বৈঠল শেজের মাঝ।
ননদীর ভয়ে বাহির না হই
বুঝিল আপন কাজ॥
সেই হতে মোর হিয়া জর জর
পরান হইল সারা।
বল বল দেখি কেমন উপায়
করিমু কেমন ধারা॥
মোর মন সেই এমত হইল
যেমন বাউল প্রায়।
পুন কর জুড়ি কহেন বচন
দীন চণ্ডীদাস তায়॥ ১৯৯৯॥

রাগ সুই সিন্ধুড়া

কহিমু কাহার আগে।
তুমি সে বেথিত তথির কারণে
কহিল তোমার লগে॥
যে দিন দেখিল কদম্বের তলে
চাহিয়া অকাজ কইনু।
সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
না জানি কি ফল পানু॥
গৃহপতি জনে বিষ সম দেখি
লোকের বচন রুঠা।
বুক দুরু দুরু কেমন করয়ে
এ বড়ি বিষম লেঠা॥
জাতি…কুল শীল আর কিবা রয়
বেক………….।
……………. করে কানাকানি
তুলএ দারুণ রব॥
কিসের……… ………….
…………….।

শ্যাম বিহনে জীবন না রহে
এ অঙ্গ হইল ঢল॥
সজ……………………
ঐছন পীরিতি লেহা।
কানুর পীরিতি যে জন করিল
তাহার পুড়এ দেহা॥ ২০০০॥

শ্রীনটু

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা॥
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই।
মরম বেদনা কহিল এই॥
ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা।
তনু তিয়াগিব এমতি ধারা॥
কেন বা চাহিল কালিয়া পানে।
হিয়া জর জর মরম স্থানে॥
কে এত সহিব বিষম তাপ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝাঁপ॥
ননদী বচনে কুশের কাঁটা।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা॥ ২০০১॥

কাফি কানড়া

কি কাজ করিনু আপন খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে।
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে॥
যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন॥
পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতেক ফান্দ।
কোন কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্ধ॥

[৭৫০ পত্র শেষ]

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

শব্দ-সংগ্রহ

[১৩৩৩, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

নবম বিভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ সম্বন্ধীয় শব্দ।

উসারা

ক—পা'ড়্।

খ—কোনাচ্।

গ—শামরুল।

ঘ—রুইও।
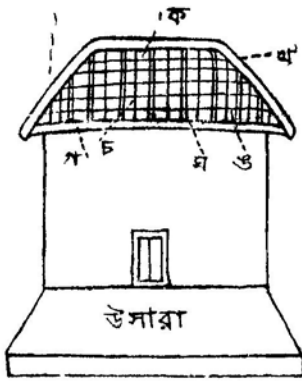
ঙ—সাঁড়োক, কাবারি, বাখারি।

চ—শিতুলি, ছিটুলি।

উসারা—বারান্দা।

মড়কোঁচা—ঘরের মাথা।

ঘা'ড়।

শয়দল।

কুমুরী।

কড়ি।

তীর।

সাতীর।

নিম্‌তীর।

তিলেট।

হাত্‌শোড়ো।

বোঠোনি।

বোঠ্যে।

বাতা।

নামাড়।

ভোঁড়।

পেলা।

পাড়ুল।

ঢালু।

ডুম্‌নি।

কব্‌জা।

ঢিলে কব্‌জা।

ছাঁচ্।

বাজু।

থাড়্।

দীর্ঘ।

ঝুনকাঠ।

বেনী বাতা।

পিঠ বাতা।

ধূল।

কেওড়—কপাট।

চৌকাঠ।

খুঁট।

কুড়সি—খুঁটির বোঠোনি (বসিবার স্থান)।

মাথ্‌লা—খুঁটির মাথা।
বাবজালা—জানালা।
মুরি—দেওয়ালের গায়ের ক্ষুদ্র ছিদ্র।
তাক।
কোলঙ্গা।
আঁল্‌গুনি—আল্‌না।
দেওয়ালের পাট—স্তর, থাক।
আন্দাবে—ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণার জায়গা।
রেল—বেলিং।
গোরোট—ভিত্তি।
কাঠাম্—আকার।
হুড়্‌কে—ঘরের দরজা বন্ধ করিবার বাঁশের খিলবিশেষ।
খিল।
শাঙ্গা।
গোঐড়।
ছাঞ্চে—যেখানে চালের জল গড়াইয়া পড়ে।
পিছ্‌কাণ্ডা, পিছেড্—ঘরের পিছন্ ধারে।
আন্দি সান্দি—ঘরের ভিতরের একেবারে কোণের আঁধার অংশ।
দুয়োর—ঘরসংলগ্ন ঘরের বাহিরের অংশ।
লাছ—বাড়ীর বাহিরে যাইবার সদর রাস্তা।
দুয়ার—ঘরের দরজা।
ধারি—উষারার প্রান্তভাগ।
বারান্দা—গৃহের বাহিরের খোলা বসিবার জায়গা।
হাঁড়্‌শিল—যে ঘরে ভাত খাইবার হাঁড়ি থাকে।
চুলোশাল, চালা—যেখানে ভাত রাঁধা হয়।
দহলিজ্—বৈঠকখানা।
দরমা—ছোট মুরগী রাখিবার ঘর।
আঁতুরঘর—যে ঘরে সন্তান প্রসব হয়।

চোর কুঠরী—সিঁড়ির তলার ঘর।
পরচালা—ঘরের দেওয়ালের বাহিরের অংশ হইতে যে একটী ছোট নূতন চাল্ তৈয়ারী করা হয়।
গোয়াল—যে ঘরে গরু রাখা হয়।
থরোটী—ঘরের দেওয়াল লেপন করা।
শুঁচ—ঘর লেপিয়া পরিষ্কার করা (শৌচ)।
ঘোলানী—শুঁচ দিবার নিমিত্ত মাটি জলের সহিত মিশাইলে যে পদার্থ তৈয়ার হয়।
লাতা—যে একটা ছোট ছেঁড়া কাপড় ঘোলনীতে ডুবাইয়া শুঁচ্ দেওয়া হয়।
উটুনো—একটা ঘরের চাল প্রস্তুত করা।
ঘর উদ্‌লান্—চাল পুনরায় ছাওয়াইবার জন্ত চালের পুরাণ খড় কাড়িয়া (বার করিয়া) ফেলাইয়া দেওয়া।
বাড়োই—যে ঘর ছায়।
নাগর ছাওয়ানী—পুরাণ ছাওয়ানীর উপর ছাওয়া।
ছিটে দেওয়া বা গুঁজা দেওয়া—চালের মাঝে মাঝে দু'এক গোছা খড় গুঁজিয়া দেওয়া।
কোঠা—মাটির এক প্রকারের দোতালা ঘর।
চিলে কোঠা—এক প্রকারের দোতালা ঘর।
বাদামে কোঠা—এক প্রকারের দোতালা ঘর।
পাখাপেড়ে কোঠা—মাটির এক প্রকারের দোতালা ঘর।

নবম বিভাগ

পাড়াগাঁয়ের খাবার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিবারাত্রে খাবার বিভাগ।

নাস্তা বা মুড়ি খাওয়া—সূর্য্য উঠিবার একটু

পরেই খাওয়া হয়। (অভ্যাগতকেই কেবল নাস্তা দেওয়া হয়)।

কড়কড়ো ভাত—সকালে পূর্ব্বদিনের রক্ষিত শুক্‌না ভাত (প্রায়ই ছোট লোকেরা খায়)।

বাসিভাত—পূর্ব্বরাত্রে জল দিয়া ভিজান ভাত। দুই ঘণ্টা বেলা হইলে খাওয়া হয় (শ্রমজীবীরা ইহা প্রায়ই খায়)।

পানি খাবার বা জল খাবার—বেলা ১১।১২টার সময় মুড়ি বা গুড় দ্বারা জল খাওয়া।

গরম ভাত—দুপুর বেলা হইতে ৩ট পর্য্যন্ত সর্ব্বা-প্রথম মধ্যাহ্নভোজন।

রেতের ভাত—২।১ ঘণ্টা রাত হইলে আবার যে ভাত খাওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের খাবার জিনিষ।

মুড়ি—চাউল হইতে প্রস্তুত হয়।

ভুজো, মুড়্‌কি, উথ্‌ড়ো—খই ও গুড়দ্বারা প্রস্তুত হয়।

খই—ধান হইতে প্রস্তুত হয়।

হুড়ুম—ধান হইতে প্রস্তুত হয়।

ফুটকলাই—কলাই ভাজিয়া তৈয়ার হয়।

গুড় ছোলা—গুড় ও ছোলা মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

মুড়ির লাড়ু—মুড়ি ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার হয়। (মুড়ির গোলাকার ডাব্‌-বিশেষ)।

কাঁকলাড়ু—খই ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

নারিকেল খণ্ড—নারিকেলশাঁস ও চিনি মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

সিন্নি—যে কোনও মিঠাইকে বলে।

পেটেলী—পাটালী ; গুড় হইতে তৈয়ার হয়। পাটা (তক্তার) উপর ফেলাইয়া করা হয়।

আদরকী—চিনি হইতে তৈয়ার হয়।

তিলুয়া—চিনি ও তিলে তৈয়ার হয়।

কদ্‌মা—চিনি হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মিঠাই।

মুণ্ডা—চিনি ও ছানা হইতে তৈয়ার একপ্রকার মিঠাই।

বুঁদিয়া—চিনি, ঘি ও ব্যাসম হইতে তৈয়ার একপ্রকার মিঠাই।

রসকরা—চিনি ও নারিকেল হইতে তৈয়ার এক প্রকার মিঠাই।

রসগোল্লা—চিনি ও ছানাদ্বারা প্রস্তুত এক-প্রকার মিঠাই।

পানতোয়া—মোয়া (খোয়াক্ষীর), ঘি ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

মতিচুর ও মিহিদানা—ঘি, চিনি ও ব্যাসমদ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

জিলাপী—ঘি বা তৈল, চিনি বা গুড় এবং কড়াইর ডাল-বাটা দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই।

কাচাগোল্লা—চিনি ও ছানা হইতে প্রস্তুত মিঠাই

লবাদ্‌—খাজুরের রস হইতে তৈয়ারী হয়।

পুয়ো, বড়া—তালের মাড়ি ও চাউলের আটা (চেলেটা) ও সরিষার তৈলে ভাজিয়া প্রস্তুত।

পাকান্‌ মালপোয়া—চাউলের আটা, গুড় ও

ঘি বা সরিষার তেলে ভাজিয়া প্রস্তুত।

আন্দরসা—চাউলের আটা, গুড় ও তৈলে ভাজিয়া তৈয়ারী।

তালের সিম—চাউলের আটা ও তালের মাড়ী হইতে তৈয়ার হয়। আকার সিমের মত।

তালের হাতচাপড়ি—তালের মাড়ি ও আটা দ্বারা হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ার হয়।

গুড়পিঠে—গুড় ও আটা মিশাইয়া প্রস্তুত।

তেলপিঠে—তালের মাড়ি, তেল ও আটা দিয়া প্রস্তুত।

সরুচিকুলি—গমের ময়দা হইতে তৈয়ার হয়। চিতাও বা আঁশকে চাউলের আটা হইতে প্রস্তুত পুরু গোলাকার পিঠে।

উল্টোপিঠে—চাউলের আটা হইতে তৈয়ার হয়। উল্টাইয়া তৈয়ার করা হয়।

ছিটেপিঠে—গমের ময়দা হইতে ছিটাইয়া ছিটাইয়া তৈয়ার হয়।

পাতমোড়া—তালের মাড়ি ও আটায় মিশাইয়া পাতার দ্বারা মুড়িয়া তৈয়ার হয়।

গুঁজা—চাউলের আটা হইতে তৈয়ার হয়। (গুঁজিয়া গুঁজিয়া সাঁই দেওয়া হয়)।

তিলসাই—তিল গুঁড়া করিয়া উহার সহিত গুড় মিশাইলে তৈয়ার হয়।

বেগুনসাই—বেগুন পুড়াইয়া উহার সহিত ডিম মিশাইলে তৈয়ার হয়।

ফুলুরি—কলাইয়ের গুঁড়া ও জলে মিশাইয়া তেলে ভাজিলে তৈয়ার হয়।

ভাঁড়চুর—আখের রসকে জ্বাল দিয়া শক্ত করিয়া তৈয়ার হয়।

ক্ষীর—চাউল, গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিলে তৈয়ার হয়।

ঝাল—চাউলের আটার খমীর করিয়া গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া উহা ডাব্‌ডাব্‌ করিয়া দিলে তৈয়ার হয়।

জাও—চাল, লবণ ও জল মিশাইয়া তৈয়ার হয়।

আঁখিয়া—আটার খমীর করিয়া গুড় ও জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া, ঐ খমীর মুঠা মুঠা করিয়া গোলাকার করিয়া গুড়ে দিলে তৈয়ার হয়।

ফিন্নি—আটা ও চিনি, কি গুড় জলে মিশাইয়া জ্বাল দিলে তৈয়ার হয়।

হালুয়া—ফিন্নির মত তৈয়ারী হয়।

পরোটা—গমের ময়দা, ঘি ও চিনি দ্বারা তৈয়ার হয়।

গড়গড়ে—আটার খমিরের গোলাকৃতি।

জুলা—রুটি তৈয়ারের জন্য গড়গড় চেপ্টা করিয়া গোলাকার খাদ্য।

ছাতু—গম ভাজিয়া পিষিয়া তৈয়ার হয়।

ধুকি—চাউলের আটা হইতে তৈয়ারী হয়।

ফুলবড়ি—মসুরি কলাই হইতে তৈয়ারী হয়।

বড়ি—মাষকলাই হইতে তৈয়ারী হয়।

পালো—আটা হইতে তৈয়ারী হয়।

ক্ষিরসে—দুধ হইতে তৈয়ারী হয়।

ঝালবড়া।

পাঁপড়।

বেগ্‌নি।

দালপুরী।

আলুর চুম।

মাউত গুড়—জলের মত গুড়।

বালিগুড়—বালির মত কর্‌করে শুক্‌না গুড়।

আমানী—বাসী ভাত খাইয়া ফেলিয়া যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বলে (কাঁজি)।

সুরুয়া—ঝোল।

কোলিয়া—থোঁড়ো, কি কুমড়ার সহিত ছোলা কলাই মিশাইয়া রাঁধিলে হয়।

পোলাও—পলান্ন, পল (মাংস) মিশ্রিত ভাত।

খোস্কাভাত—সাধারণ ভাত।

কুরমা—মাংসে প্রস্তত।

কাবাব—মাংসে প্রস্তত।

কোপ্তা—মাংসে প্রস্তত।

গোস্তাত ভুনা—মাংস ভাজা (ভুনা—ভাজা)।

ঝালুন—তরকারী।

আণ্ডা—ডিম্ (অণ্ড-শব্দ)।

আণ্ডা বিরুন (বেরুহান)—ডিমভাজা।

বায়জা (ডিম) বা আণ্ডা বেরেস্তা—ডিম ভাজিবার অন্য প্রণালী।

(বেগুনের) খোগিনী—বেগুন পুড়াইয়া আণ্ডার সহিত ভাজিলে তৈয়ার হয়।

আলু, মাছ বা কলাই শানা—ভর্‌তা করা।

শাক চড়চড়ি—শাক ও জাল-মাছে রাঁধা।

খাটা শানা—তেঁতুল খাটা লবণের সহিত জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া যায়।

আলুর দুম—আলু গোটা রাখিয়া রাঁধিবার প্রণালী।

কলাই সিজেন—সিদ্ধ করা।

দালের জুস—দাল্ না খাইয়া উহার উপরের দালহীন অংশ খাওয়া।

একাদশ বিভাগ

পল্লীজীবনের উৎসব ও সামাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বিয়ে, শাদী—সাধারণ বিবাহকে বলে।

নিকে, নিকা—স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে নিকা বলে।

আকোদ্, আগোদ্—স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গেলে পুনরায় যে বিবাহ হয়।

স্বামীর বিভিন্ন নাম :—

পুরুষ—স্বামী, সাধারণ স্ত্রীলোকে নিজের স্বামীকে বলে।

ভাতার—একজন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকের স্বামীকে সাধারণ ঠাট্টা, কি খারাপ ভাবে বলে।

দামান—স্ত্রীলোকে অপরের স্বামীকে বলে।

দুলা—নববিবাহিত স্বামী।

বর—বিবাহ করিতে উদ্যত স্বামী।

নওশাহ— ঐ ঐ।

স্ত্রীর বিভিন্ন নাম :—

বিবি—স্ত্রী।

জানানা—সাধারণ স্ত্রীলোক।

মাগ—সাধারণ লোকে খারাপ ভাবে অপরের স্ত্রীকে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শব্দ।

ঢোল দুল—ঢাকঢোলের বাজাইয়া বিবাহ হওয়া।

শায়াই—মুসলমানের শরিয়ত অনুসারে বিবাহ হওয়া।

সুমুদ্ পাতান—বিবাহের সম্বন্ধ করা।

ঘটোক্—যে সম্বন্ধ বা বিবাহের কথা চালায়।

ঘটকতালি—সমুদ পাতান।

ল সুমুদে—বিবাহের সম্বন্ধের জন্য বরপক্ষের লোকের কন্যাপক্ষের বাড়ীতে যাওয়া।

ঘর বর দেখা—কন্যাপক্ষের লোকের বরের বাড়ীতে যাইয়া বর ও বরের বাড়ী দেখা।

দিন ফেলান—দিন নির্দ্ধারিত করা।

লগুন—বিবাহের দুই দিন আগে বরপক্ষের লোক কন্যাপক্ষের বাড়ীতে কাপড় গহনা ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে। ইহাকে লগুন বলে।

থুব্‌ড়ো ভাত—বিবাহের আগের দিন কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের বাড়ীতে বর ও কন্যাকে নিজের নিজের বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে যে ভাত খাওয়ান হয়।

রীত রসুম—দেশে প্রচলিত সমস্ত প্রথা পালন।

মিরাসুন—যে সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতর বিবাহের সময় গান করে।

নহবৎ বাজান—উঁচু জায়গার উপর বাজনা বাজান।

হোল্‌দে খ্যাড়্—বিবাহের আগের দিন পিতামহ, মাতামহ ও ভগিনীপতিকে ডুলিতে চরাইয়া ঢোল বাজাইয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরান হয় ও হলুদ ও রং ছিটান হয়।

গাওকুলী—বিবাহের আগের দিন বর ও কন্যা-পক্ষের বাড়ীতে যে ভোজ হয়।

উঠে আসা—ক'নের বরের বাড়ী যাইয়া বিবাহ করা।

চোড়ে যাওয়া—বরের ক'নের বাড়ী যাইয়া বিবাহ করা।

শিয়ারা—যাহা দ্বারা বরের মাথা সাজান যায় ও তাহাতে ২।১টা ফুল থাকে।

চৌদোল—যে সুসজ্জিত আসনের উপর চড়িয়া নওসাহ (বর) ঢোল, ফুল, ঝাড়, মশাল, হাওয়াই, চোর্‌খি, বুম, কদুম, পটোকা, ফনাশ প্রভৃতি আতস-বাজীর সহিত সমস্ত গ্রাম ঘুরে।

গাঁগোস—সমস্ত গ্রাম বরকে ঢোল বাজাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান।

বরাত
ম্যামান } বরযাত্রী।

ডুলি, মাফা, পাল্কী—যানবিশেষ।

বিবি—বরের যে সব স্ত্রীজাতীয় আত্মীয় ডুলি ও পাল্কীতে চড়িয়া বরের সঙ্গে ক'নের বাড়ী যায়।

কাহার, বেহারা—পাল্কীবাহী ব্যক্তি।

ব্যাগার—বিনা পারিশ্রমিকে জিনিষপত্র বহনকারী ব্যক্তি।

সিদে—বরের বা কন্যার পক্ষের লোকেরা বেহারাদিগের খোরাকস্বরূপ যাহা দেয়।

মদের ইলিম্—পাল্কীবাহীদিগকে মদ খাইবার জন্য যে পয়সা দেওয়া হয়।

সাত পাক্—বরের ক'নের বাড়ী যাইয়াই প্রথমে সাত পাক ঘুরা।

আলুম তালা—ঘুরিবার পর ক'নের বাড়ীর আঙ্গিনার মাঝখানে চারিদিকে বড় বড় কুঞ্চি (সরু বংশদণ্ড) পুঁতিয়া

যে আসন ও বিছানা পাতা হয় (স্থাপন করা হয়)। বর সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া সরবৎ খায়।

তখ্‌ত (সিংহাসন)—তৎপরে বর—নওশাহ (নবশাহ-বাদশাহ)-দহলিজে (বৈঠক-খানায়) যেখানে আসন পাতা থাকে, সেখানে বরযাত্রীর মাঝে বসে।

তখ্‌তের কাপড়—যে কাপড় দ্বারা নওশার আসন আবৃত থাকে।

অজু করা—বর ও বরাতদিগের হাত পা মুখ ধৌত করা।

সরবৎ, শর্‌বোৎ—চিনি ও গোলাপ-মিশ্রিত সুমিষ্ট জল।

বিরিদান—পান রাখিবার আধার।

পানের খিলি—মসলা সহ এক একটা তৈয়ারী পান।

হুঁকা খাওয়া }
তামাক খাওয়া } ধূমপানবিশেষ।

হুঁকা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কথা—

গর্‌গরা—হুঁকার নামবিশেষ। পিতলের তৈয়ারী।

ফোরসি— ঐ ঐ।

সটকা— ঐ ঐ।

নারিকেলের হুঁকা—নারিকেলের খোলার তৈয়ারী।

নৈয়চে—হুঁকার যে অংশের উপর কল্কি থাকে, সেই লম্বা কাষ্ঠময় অংশ।

চিলুম—কল্কি।

তাওয়া—চিত্‌রে কল্কি।

গুল—যে তামাক খাওয়া হইয়াছে, তাহার পোড়া অংশ।

টিকে, গুল—ইহা পুড়াইয়া তামাক খাওয়া হয়।

কাঁই—চিলুমের ভিতর তামাকের যে অংশ লাগিয়া থাকে।

মুটি, লুটি—খড়কে চিলুমের মাথার মত গোল করিয়া পুড়াইয়া তামাক খাওয়া হয়, ঐ খড়কে মুটি বলে। এইরূপে বিভিন্নরূপে তামাক খাওয়া হয়।

নাস্তা—তৎপরে সন্দেশ, রুটি, ফিন্নি যাহা মেহমানদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

খানা—তৎপরে 'ভোজ' খাওয়া।

দেন্‌মোহর—কয়েক শত বা হাজার টাকা বর কর্ত্তৃক বিবাহের সময় ক'নের নিকট ঋণ স্বীকার করা।

আগোদবস্ত—বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করা, বিবাহ।

আগোদ্‌বোস্ত পড়ান—বিবাহ পড়ান।

গওয়া—বিবাহ হইল, তাহার সাক্ষী (ক'নে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে) এই কথা যিনি প্রকাশ করেন।

উকীল—বিবাহ পড়াইবার সময় যে ব্যক্তি, ক'নে রাজী হইয়াছে বলিয়া ক'নে-পক্ষ সমর্থন করেন।

মোল্লা বা কাজী—যিনি বিবাহ পড়ান।

খোত্‌বা—বিবাহ পড়ানের পরেই কোরান শরীফের কিয়দংশ পড়া।

মোনাজাত—সকলে বর ক'নের উপর আশীর্ব্বাদ জন্য প্রার্থনা করে।

কাজারী—বরপক্ষের নিকট হইতে ক'নের গ্রামের লোকেরা মস্‌জিদ বা স্কুলের জন্য যাহা কিছু আদায় করে।

জুলুয়া—স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর মুখ দেখান।

বাঁসোর ঘর—যে ঘরে স্ত্রী-পুরুষে প্রথম রাত্রি যাপন করে।

হাজ্রি—সন্দেশ ও রুটি, যাহা কন্যাপক্ষের লোকে বরপক্ষকে বিবাহের পর দেয়।

নীছার—বরাতেরা বিবাহ হইয়া গেলে বরের পিতাকে আনন্দ প্রকাশের জন্য যে টাকা কড়ি দেয়।

বো-হাজরি, বৌভাত—বৌ (বধূ) প্রথমে শ্বশুরালয়ে যাইলে সেখানে তিন দিনের দিনে যে উৎসব হয়।

মুখ দেখানি—নূতন বধূর মুখ দেখিয়া যে টাকা দেওয়া হয়।

আটমঙ্গলা—বৌ প্রথমে শ্বশুরালয়ে তিন দিন থাকিবার পর নিজের বাপের বাড়ী যায়। তখন জামাতাও ঐ সঙ্গে যাইয়া আট দিন থাকে। তাহাকে আট-মঙ্গলা বলে।

দুলা, দামানমিয়া—আটমঙ্গলায় যাইলে তখন সকলে জামাইকে ঐ নামে ডাকে।

বাদ্‌গোস্তী—জামাতা তার বাড়ী আসিয়া পুনরায় শ্বশুরালয়ে যায় ও কিছুদিন থাকে।

সালামী—বর বাদ্‌গোস্তীর শেষ দিন ক'নের আত্মীয় স্বজনকে সালাম করিয়া মিঠাই ও কিছু অর্থ দিয়া যায়। ঐ অর্থের দ্বিগুণ আবার ক'নে যখন বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক লইয়া শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন দিতে হয়।

নবোশ্‌তে, ন-বোশ্‌তে—কন্যার বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া।

বিবাহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা,—

দোজবেরে—যে পুরুষের ১ম স্ত্রী মারা গিয়াছে ও ফের ২য় পত্নী গ্রহণ করিয়াছে।

তেজবেরে, ত্যাজবেরে—যে দ্বিতীয় স্ত্রী মরিলে ৩য় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে।

নোতুনি, নোতুনি—নূতন বৌ, যার এখনও ছেলে হয় নাই।

কাঠবাপ্‌—যে স্ত্রীলোক ১ম স্বামী মরিবার পর ২য় স্বামী গ্রহণ করে, তাহার পূর্ব্বস্বামীর ছেলেগুলি নব স্বামীকে কাঠবাপ বলিবে।

রাড়্‌ বেওয়া—বিধবা স্ত্রীলোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের জন্মসম্বন্ধীয়।

সাধ্‌ভাত—যুবতী স্ত্রীলোককে তাহার সর্ব্ব-প্রথম সন্তান প্রসব করিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে তাহার আত্মীয়গণ ধুম্‌-ধামের সহিত ভোজ করিয়া যে ভাত খাওয়ায়।

পোয়াতি—যে স্ত্রীলোক গর্ভিনী।

আঁতুর ঘর—যে ঘরে সন্তান প্রসব করে।

কামান—সন্তান প্রসব হইলে প্রসূতি ও সন্তানকে কামাইয়া দেওয়া।

আজান্‌ দেওয়া—ছেলের কাণে খোদাতালার প্রশংসাসূচক বাণী শুনান।

আঁতুর বেরেন—প্রসূতি যখন বাহির হইয়া সংসারের সমস্ত কাজকাম করিবার ক্ষমতা পায়। কেন না, এতদিন সে অপবিত্র ছিল।

ভুঁজোন—ছেলের মুখে ভাত দেওয়া উৎসব।

আঁকিকা—ইস্‌লাম ধর্ম্মের শাস্ত্র অনুযায়ী ছেলের নামকরণ উৎসব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) শাস্ত্র অনুযায়ী নাম থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্বন্ধ রাখিয়া ছেলে পিলের ডাকনাম রাখা হয়, যথা :—

কটা—যে ছেলের রং শাদা হয়।

কটী—যে মেয়ে-ছেলের রং শাদা হয়।

কেলে—যে ছেলের রং কাল হয়।

ভুঁদা, ভুঁদু—যে ছেলে ছোট বেলায় ভোঁদাল বা মোটা থাকে।

ফড়িং—যে ছেলে ছোট বেলায় খুব সরু দুর্ব্বল-কায় হয়।

খুদা—ছোট ছেলের সাধারণ নাম।

খুদী—ছোট মেয়েছেলের সাধারণ নাম।

আকালে, আকাই—যে ছেলের দুর্ভিক্ষের (আকালের) বৎসর জন্ম হয়।

আকালী—যে মেয়েছেলের দুর্ভিক্ষের বৎসর জন্ম।

গাজ্লু—যার ভয়ঙ্কর বর্ষার দিনে (গাজোলে) জন্ম।

বান্নু—যার বন্যার সময় জন্ম হয়।

খুদী—যে মেয়েছেলেকে যমের নিকটে খুদ্ দ্বারা কিনা হয়।

খুদু—যে ছেলেকে যমের নিকটে খুদ্ দ্বারা কিনা হয়। (খুদ্—চাউলকণা)।

এককড়ি—যে ছেলেকে একটি কড়ি দ্বারা যমের নিকট কিনা হয়। যতটি কড়ি দ্বারা যমের নিকট হইতে ছেলেকে কেনা হয়, কড়ির সেই সংখ্যানুসারে ছেলের নাম। যথা,—
দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচু বা পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, নকড়ি।

(খ) ছোট বড় হিসাবে সাত-ভাইয়ের নামকরণ।

বড়—প্রথম ভাই।

মাইতোর বা মেজো—দ্বিতীয় ভাই।

ল, ন—তৃতীয় ভাই।

সেজে, শায়লে—চতুর্থ ভাই।

ফুল—পঞ্চম ভাই।

খুদে—ষষ্ঠ ভাই।

ছোট—সপ্তম ভাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলমানী নাম।

খত্না বা মুসলমানি—লিঙ্গাগ্র ছেদন উৎসব।

হাজাম—যে লিঙ্গাগ্র ছেদন করে। (ছোট বেলায় পুত্রের লিঙ্গাগ্র ছেদন প্রত্যেক মুসলমান পিতার অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কানফুড়া (ফোড়া) উৎসব।

কানফুড়া—একটী পিতল, কি সোনার বালী ছোট মেয়েছেলের কানে ফুড়িয়া দেওয়া হয়।

গড়গড়ে—কানফুড়া হইলে সমাগত পাড়ার ছেলেগুলিকে আটার খমীরের যে এক রকম গোল পদার্থ তৈয়ার করিয়া সিন্নি বা সন্দেশ সহ দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত উৎসব।

(নিম্নলিখিত উৎসবের সহিত মুসলমান শাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই)

লবান, নবান—নবান্ন, ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নূতন ধান্যের নবান্ন।

সাঁক্রাত—পৌষ সংক্রান্তির উৎসব, পৌষ মাসের শেষে হয়।

পোয্‌গুলি বা কাজি সাহেবের খানা—১লা মাঘ মাঠের সমস্ত ধান তোলা হইলে ও বাড়ী আসিলে গ্রামের লোকে এক জায়গায় মাঠে ভোজ খায়।

ক্ষীর—এক জায়গায় সকলে মিলিয়া মস্‌জিদের সাম্‌নে ক্ষীর পাক করিয়া উৎসব করার নাম। ইহা মুসলমানেরা বৃষ্টি হইতে দেরী হইলে প্রায়ই করে। সাধারণতঃ মুসলমানের রোজা (উপবাস ব্রত) শেষ হইলে তাহার পরদিন যে উৎসব হয়, তাহাকে ক্ষীর বলে।

খোদায়ী খানা—ভাল ফসল হইলে যে কোনও ব্যক্তি যে খানা করিয়া গ্রামের লোকদিগকে খাওয়ায়, সেই খানাকে খোদায়ী খানা বলে।

ব্যারা—ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতি বারে হইয়া থাকে। জলে যাহাতে ছেলে না ডুবে, সেই উদ্দেশ্যে ইহা করা হয়। মুসলমানেরা ইহাকে "খেয়াজ খিজির"ও বলে।

সোদ্‌গুরু পীর—কোনও সৎগুরু (পীরের) উদ্দেশ্যে (যে পীর জীবিত নাই) উৎসব করার নাম।

মাদার—একটা লম্বা বংশদণ্ডে নানা রংয়ের কাপড় জড়াইয়া নাচান হয়, ইহাকে মাদার নাচা বলে।

আমৃতি—একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় অনেক লোক জমা হইয়া, একজন পালোয়ান আর একজনের সহিত কুস্তি করে, এই দৃশ্যকে আমৃতি বলে।

পীর পৌরি—পরব উৎসব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাড়াগাঁয়ের আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত ও গান সম্বন্ধীয় শব্দ।

লোট্‌-ও—এক প্রকারের প্রচলিত গান।

বেইলো, বেহুলা— ঐ　ঐ।

যাত্রা— ঐ　ঐ।

কবি— ঐ　ঐ।

ইহার দুই ভাগ—কবি ও খেউর।

জুংনামা—মুসলমানের গীত। অধুনা লুপ্ত।

কীর্ত্তন—হিন্দুদিগের ভিতর প্রচলিত দেবতার গুণগান।

সত্যপীরের গান—যে গানে পীরের (সাধু পুরুষের) মহিমা বর্ণন হয় (প্রায় লুপ্ত)।

মিরাসুন—বিবাহের সময় সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা যে গান করে।

ঝুমুরী—যে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা অশ্লীল গান করে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত ব্যক্তিদিগকে শুনায় (প্রচলিত)।

বাই খ্যাম্‌টা—যে দুষ্টা স্ত্রীলোকেরা গান করে (প্রচলিত)।

পাল্লা—তুইটী বিভিন্ন গানের দলের প্রতি-যোগিতায় গান করা।

রং রুং করা—গানের মধ্যে দ্ব্যর্থসূচক রহস্য-কর গান করা।

সং করা—গানের মাঝে মাঝে তামাসা করা।

ছড়া কাটাকাটি, বোল্ কাটাকাটি—গানের আসরে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া গান করা।

দুয়ার ধরা—অনেকে এক সঙ্গে গান করা।

দ্বাদশ বিভাগ

পল্লীগ্রামে প্রচলিত ব্যায়াম ও খেলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) বালকদিগের শারীরিক ব্যায়াম সকল।

হাডুডুডু। সুন্দাডী। খইদই। দয়াখয়া। রবোরবি। ডবাডবি। সোনা পোঁতাপুঁতি। সাকো ড্যাঙ্গাডেঙ্গি। গুটি দিয়াদিয়ি। সিন্দুর টুপাটুপি।

টিক্ লিয়ালিয়ি=জলে সাঁতরাইয়া খেলিতে হয়।

ঝালঝুল্লি—গাছে ঝুলিয়া মাটিতে পড়া।

আনিমুনি—ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করা।

তাঁত বুনাবুনি= ঐ ঐ।

ঘোঁড়া ঘুঁড়ি।

(খ) লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধীয়—ডাংগুলি। টিয়ে খেলা। তীর কাম্‌টা। ছোল্‌লড়ি।

(গ) বালকদিগের মানসিক ব্যায়াম।

বাঘ্ বক্‌রী। এক বাঘ। মোগল চাল্। বার পেঁতে। তিন পেঁতে। গোপা গোপি। ন পেঁতে। নাকি পুরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাদিগের ব্যায়াম।

(ক) ছোট বালিকাদিগের শারীরিক ব্যায়াম।

ইচিং বিচিং।

এই খেলা খেলিতে বালিকারা নিম্নলিখিত গান করে :—

ইচিং বিচিং জামাই চিচি,
ফুল ফুটেছে থকা থকা তাতে
বড় কড়ি।
আড়াই মাসে ডিম্ পেড়েছে, লটে গাছের
বুড়ি।
লটে রে হট মট শাউনেরি শীষ
হেনা ঠাকুর বর দিয়েছে,
খারোই মারোই বিষ।
পঞ্চার মা ধান কুটো পঞ্চা খায় খুদ্
বাঁশতলাতে ঘুঘু ডাকে পঞ্চারে পুত।
বল্‌লো ফাজেলা পুরুত।

আগাডুম্ বাগাডুম—

এই খেলা খেলিতে নিম্নলিখিত গান গাওয়া হয়।

আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ডান মোন্‌তোর ঘোঁগোর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে গগন পুর,
গগনে আছে অণ্ডি বণ্ডিংটীয়া টশকুন
বড্‌ডির বামুন
হেঁচকে পাথ রাই রথ রাজা তুই
তাইতো বলে গীতের 'মতু'ই।

আলুন বালুন—ইহা খেলিতে নিম্নলিখিত গান

গাওয়া হয়,—

আলুন বালুন চালুনখানি,
মেইদি গাছের গুড়ি ;
সাত টাকা দিয়ে বিয়ে করলাম
খাঁদি নাকি ছুঁড়ি ।
খাঁদা হোক বোঁচা হোক তাও আমি পরি,
সানোক সামুক ভাত খায় ঐ জলুনে মরি,
বোল্ 'ফাজেলা' কি করি ।

আতালি পাতালি ।

নিম্নলিখিত গান গাওয়া হয়,—

আতালি রে পাতালি
শাম গেল শাতালি ।
শামেদেরই বৌ-দুটি পথে বসে কাঁদে,
কেঁদ না মা কেঁদ না গুড় ছোলা দিব,
গুড় ছোলা খাব না মা বাপ্‌দের বাড়ী যাব,
বাপ দিলে হল্‌দি
মা দিলে ঝারি ;
চট করে মা বিদায় কর
রথ চলেছে ভারী ।
ই রথে যাব না মা উল্টো রথে যাব,
দুই সতীনে কাঁটাল কিনে,
মিলে মিশে খাব
গাব গুবাগুব গাব ;
ফাজেলা এইতো আমি খাব ।

আলফুল ।

(খ) বালিকাদিগের মানসিক ব্যায়াম ।

চাক্ চাকুলা—ইহার নিম্নলিখিত গান ।

চাকরে চাকুলা,
বেঁশের পাতা পাকুলা,
ধান ভান্‌তে শিকুলা ।
চন্নক তুলে মার্‌তে ঝাং
পুকুরে পাঁচ খান,
ক্যালা ক্যালা গাছখান ।
মাগুর মাগুর মাছখান,
'ফাজু' চায় সবখান ।
"ভাবু" হেসে আটখান ।

দান দিয়াদিয়ি ।

ধাপাঘটিং ।

(গ) খেলাতে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী :—

খেলাপাতি—ভবিষ্যতে কিরূপে গৃহস্থালী ও ঘরকন্না করিতে হইবে, তাহা খেলাপাতি নামক খেলার মধ্যে ছোট বেলায় অতি সামান্য জায়গার মধ্যে গৃহস্থালীর আস্‌বাব ও খাবার জিনিষের মত নানা প্রকারের জিনিষ লইয়া খেলা করিয়া বালিকারা বেশ বুঝিতে পারে । এই সব দেখিয়া বোধ হয় যে, আমাদের ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রাকৃতিক নিয়মে কিণ্ডার গার্টেনের মত কার্য্য হইয়া যায় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খেলায় হার্‌জিত ।

চাঁদ, চিক্, হাঁড়ি } এক দল বা একজন আর একদল—বা জনকে হারাইয়া দিলে পরাজিত পক্ষকে অপর পক্ষ চাঁদ, চিক্, হাঁড়ি লাগায় ।

ত্রয়োদশ বিভাগ

বিভিন্ন প্রকারের শব্দসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন প্রকারের জন্তুকে ডাকিবার বিভিন্ন শব্দ।

হাম্বা আয়—হ্যা হই—গোরুকে ডাকিতে লোকে বলে।

আতু আয়—কুকুরকে ডাকিতে লোকে বলে।

আর্‌রা আয়—ছাগলকে ডাকিতে লোকে বলে।

আফুর্‌রা—ছাগলকে ঐ ঐ।

কড়ে কড়ে আয়—হাঁস ঐ ঐ।

তোই তোই—হাঁস ঐ ঐ।

আতিতি আয়—মুরগিকে ঐ ঐ।

পুষ্‌ পুষ্‌—বিড়ালকে ঐ ঐ।

হ-হ, র-র—গরুকে থামাইতে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোন জন্তুকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

হুশ্‌—মুরগিকে তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

ছেই—কুকুর তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

লিই—ছাগল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

বিল্‌—বিড়াল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

হাট্‌—হাঁস তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

দিগ্‌ দিগায়—গরু তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপমা সহিত রংয়ের বিভিন্ন নাম।

কালোভোঁম্‌রা, কালো কিশ্‌কিশে, কালো ইচুঁটি, কালো ধানষুনো—অতিরিক্ত কালো।

লাল বীম, লালভবোক্‌, লাল সুরাখ, লাল টুকটুকে—খুব লাল।

সাদা বগ্‌বগে, সাদা ধপ্‌ধপে, সাদা ফট্‌ফটে, ধলো বুরাক্‌, ধলো দুধ—খুব সাদা।

কাঁচা হর্‌হরে—খুব সবুজ।

তর্‌তরে কাজোল জল—উজ্জ্বল কজ্জলবর্ণ-বিশিষ্ট জল।

পুড়িয়ে ঝাইকল্লা—পুড়াইয়া কালো ছাই করা।

আঁধার ঘুরঘুটো—খুব অন্ধকার।

সমাপ্ত

মোল্লা শ্রীরবীউদ্দীন আহমদ্‌

কবীন্দ্র রমাপতি*

কবীন্দ্র রমাপতি চন্দ্রকোণার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম দেওয়ান গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহের নাম রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাবিষ্ণু কাঁথির নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গাবিষ্ণুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম দেওয়ান রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনিও নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সদাচারী গৃহস্থ ছিলেন। চন্দ্রকোণার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ আচারে ব্যবহারে ও সামাজিকতায় তৎকালের আদর্শ ছিল।

গঙ্গাবিষ্ণু বেশী দিন দেওয়ানী-কার্য্য করিতে পারেন নাই। দারুণ সঙ্গীত-পিপাসাই তাঁহার কাল হইল। তিনি সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া, উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা মানসে ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ দেওয়ানী পদে বাহাল হইলেন।

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল যাবৎ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতি উন্নত ছিল এবং পরোপকারে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিত। আর্ত্তের সেবা, বুভুক্ষিতে অন্নদান, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়নের রীতিমত ব্যবস্থা, তিনি তাঁহার বাসস্থান চন্দ্রকোণা ও কর্ম্ম-স্থান কাঁথিতে করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই চন্দ্রকোণায় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এবং দানশীলতা ও বদান্যতার জন্য তাঁহারা চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চন্দ্রকোণায় ইহাঁদের প্রাসাদতুল্য বসতবাটী ইনিই নির্ম্মাণ করাইয়া যান।

বাঙ্গালা ১২৩০ সালে সমুদ্র হইতে এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাত আসিয়া হিজলি কাঁথিকে বিষম বিপন্ন করিয়া তুলে। দেওয়ান রামকৃষ্ণ এই সময় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া এবং নিজ সঞ্চিত অর্থরাশির সদ্ব্যবহার করিয়া প্রায় ৩০।৪০ হাজার নরনারীকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার যোগ্যতার ও পরহিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ সরকার বাহাদুর "খেলাৎ" দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসরকার হইতে সম্মান লাভের পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গঙ্গাবিষ্ণু চন্দ্রকোণায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণও একজন সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। মহম্মদ বক্স ও আস্‌মৎ উল্লা নামক দুইজন পশ্চিমদেশীয় প্রসিদ্ধ কলাবৎ এক সময় যকপুরের রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। রায় মহাশয় সরকারী কাননগোঁইর কার্য্য করিতেন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। দেওয়ান রামকৃষ্ণ আমন্ত্রিত হইয়া যকপুরে গায়কদিগের

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গুণগাথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে চন্দ্রকোণায় লইয়া যান এবং ৫।৬ বৎসর কাল তাঁহাদিগকে সেখানেই রাখিয়া দেন।

কবীন্দ্রের যখন জন্ম হয়, তখন দেওয়ানবাড়ীর অবস্থা খুব স্বচ্ছল। দানে, মানে, সমৃদ্ধিতে, সঙ্গীতালোচনায় তাঁহাদের গৃহ তখন সর্ব্বদাই সরগরম থাকিত। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে ইঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবীন্দ্রের বয়স যখন ৭।৮ বৎসর, তখন একদিবস অপরাহ্ণে তাঁহার পিতা গঙ্গাবিষ্ণু একটী জটিল রাগিণীর আলাপচারি করিতেছিলেন এবং তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন ; অবশেষে সন্ধ্যার সময় তিনি একটু হতাশ হইয়াই আহ্নিকের জন্য উঠিয়া পড়েন। বালক রমাপতি এই অবকাশে পিতার পরিত্যক্ত রাগিণীটা আলাপ করিতে থাকেন। ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাবিষ্ণু আলাপ শুনিয়া মনে করিলেন, তাঁহার কোন সাকরেদের এই কার্য্য। তিনি আহ্নিক শেষ করিয়া চুপি চুপি বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্রেরই এই কার্য্য; তিনি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন যে, আলাপটি অনেকটা তাঁহার অনুরূপই হইতেছে। রমাপতি পিতার পুনরাগমনের সময় বুঝিয়া যেমনই পলাইতে যাইবেন, গঙ্গাবিষ্ণু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, সাহস দিয়া সস্নেহে পুত্রকে উৎসাহবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, যেন সে প্রত্যহই তাঁহার নিকট সঙ্গীতের পাঠ লয়। এই সময় হইতেই কবীন্দ্রের সা রি গা মা সাধা সুরু হইয়া গেল। পরবর্ত্তী ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কিশোর রমাপতির কণ্ঠে তাঁহার পিতার অর্জ্জিত বহু রাগরাগিণী স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। পূর্ব্বোক্ত খাঁ সাহেবদ্বয়ের আগমনে চন্দ্রকোণার বাটীতে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল—গঙ্গাবিষ্ণুর গুণপণা ও কালোয়াৎগণের কস্‌রৎ একত্রে মিলিত হইয়া প্রতিভাশালী রমাপতির উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ দুবে নামক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ্, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ গায়ক শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মৃদঙ্গী রামমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এ সময় গঙ্গাবিষ্ণুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং সকলেই রমাপতিকে বিশেষ স্নেহ সহকারে তাঁহাদের "চাল" দিয়াছিলেন। এইরূপে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতেই রমাপতি বীণাপাণির মধুর ঝঙ্কারের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসীতেও ইনি কৃতবিদ্য হন।

দেওয়ান রামকৃষ্ণের সহায়তায় রমাপতি কাঁথির নিমকমহালের মির-মুনসির পদে বাহাল হইয়াছিলেন ; কিন্তু রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইনি অধিক দিন কার্য্যে বাহাল থাকিতে পারেন নাই। নিমকমহাল উঠিয়া যাইবার কথায় তিনি পূর্ব্ব হইতে চাকুরী লাভের চেষ্টায় কাঁথি ত্যাগ করিয়া যান এবং ময়ূরভঞ্জের রাজসরকারে ও সুজামুঠা মাজনামুঠা সেরেস্তায় কার্য্য করিতে থাকেন। ময়ূরভঞ্জে থাকার সময় তিনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন এবং উড়িয়া সঙ্গীতও রচনা করেন।

এক সময়ে তিনি সমস্ত চাকুরি ছাড়িয়া দিন কয়েক নিজ বাটীতেই অবস্থান করিতে থাকেন এবং আপনার বৈঠকখানার ঘরে একটি গানের আখড়া স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত

সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে থাকেন। চন্দ্রকোণার বিশ্বম্ভর দাস ওরফে বিশুদাস ইঁহার সাকরেদগণের মধ্যে বেশ নামজাদা ওস্তাদ হইয়াছিলেন। বিশুদাস ইঁহার বাটীতে গরুর রাখালি করিত ও জাতিতে বৈষ্ণব ছিল।

এই সময় রমাপতি বর্দ্ধমান রাজসেরেস্তায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং কাজেই চন্দ্রকোণায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বিশুই তথাকার "মওড়া" রাখিতে লাগিল এবং কবীন্দ্রের সাকরেদ-গণও বিশুকেই ওস্তাদ করিয়া, তাহার নিকট গলা ও হাত সাধিতে লাগিল।

চন্দ্রকোণা বর্দ্ধমানরাজের জমীদারি। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর রমাপতির গুণপনার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন এবং জমীদারির দেওয়ানপদে বাহাল করিয়া, একজন প্রধান পার্ষদ করিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহার সাহচর্য্যে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অধিরাজ বাহাদুর বাস্তবিকই একজন গুণগ্রাহী ছিলেন এবং নিজেও জ্ঞান ও গুণের চর্চ্চা করিয়া দেশে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তিনি সমগ্র মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, সাধারণে প্রচার করিয়া দেশের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। হিন্দুধর্ম্মের আচার ও ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অধ্যাপকগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার শতাধিক প্রশ্নের মীমাংসা করাইয়াছিলেন এবং পরে স্বয়ং সেগুলির সমাধান করিয়া "প্রশ্নোত্তরমালা" নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নসমূহের সবগুলিই অতি অপূর্ব্ব এবং প্রশ্নোত্তরমালাখানি পড়িলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। বর্দ্ধমানে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই রমাপতির আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু অধিরাজ বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার সকল অভাবই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যহই রমাপতি নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

একদা অধিরাজ বাহাদুরের একটা খেয়াল চাপিল। এটাকে হয় ত শুধু খেয়াল বলিলে চলে না। উপনিষদের ক্ষত্রিয় রাজর্ষিদিগের অনুরূপ ব্রহ্মবাদী গুরু হইবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের নিকট (এ সময় মহাভারত অনুবাদ লইয়া তাঁহার সভা ব্রাহ্মণপণ্ডিতে পরিপূর্ণ ছিল) কথা পাড়িতেই একবাক্যে সকলে "ভাষ" দিলেন যে, অধিরাজ বহাদুরের ইচ্ছা শাস্ত্রবাক্যের প্রতিকূল নহে। আর যায় কোথা? প্রথমেই সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়কে ব্রহ্মমন্ত্র দিতে চাহিলেন। তত্ত্বরত্ন মহাশয়ও নিজের "ভাষ" এড়াইতে না পারিয়া দীক্ষা লইলেন এবং অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, পরমেশ্বর বেদরত্ন প্রভৃতি সভাস্থ বহু পণ্ডিতই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অবশ্য এ ব্যাপার গুপ্তভাবেই সম্পাদিত হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজের ভয় ইহাতে রহিল না। ইহাতে পারলৌকিক লাভলোকসান সহসা বুঝা না গেলেও, শিষ্যবর্গের বর্দ্ধহারে যে দক্ষিণার

মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ইহলোকের স্বচ্ছলতা আনিয়া দিল, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই; সুতরাং নূতন গুরুকরণের ফল যে তাঁহারা হাতে হাতেই পাইতে লাগিলেন, তাহা একরূপ অবিসম্বাদিত সত্য। কাজেই শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং রাজসেরেস্তার যাবতীয় কর্ম্মচারীও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। প্রতি সন্ধ্যায় শিষ্য ভোজনের ধুম পড়িয়া গেল। কৃপাসিন্ধু অধিরাজ বাহাদুর একাধারে অন্নবস্ত্র-শিক্ষাদীক্ষাদাতা গুরু হইয়া মুক্তহস্তে শিষ্যবর্গের যাবতীয় অভাব মোচন করতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সভামধ্যে একদিন কথা পড়িল, দেওয়ান রমাপতি কেন অধিরাজ বাহাদুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন না। কথাটা অধিরাজ বাহাদুরের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। দেওয়ানকে তলব পড়িল, দেওয়ানও হাজির হইলেন এবং সকলেই তাঁহাকে যুক্তি তর্কে ফেলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম রমাপতি নির্ব্বাকেই অবস্থান করিতেছিলেন, কেবল অধিরাজ বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই দীক্ষা লইয়াছেন, সুতরাং দুইবার দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই এবং ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু বিধায় অন্য কোন জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারে না। অনেক তর্ক, অনেক বিতণ্ডা চলিতে লাগিল—গাধি-নন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি হইতে কবীর, নানক, সুরদাস পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখান হইল যে, গুরুগিরি শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিয়া নহে, উপযুক্ত হইলেই গুরু হইতে ও করিতে পারা যায়। রমাপতি "বাগ" মানিলেন না এবং অধিরাজ বাহাদুরও একটু বিরক্ত ভাব দেখাইলেন। রমাপতি নিঃস্ব হইলেও তাঁহার হৃদয়ের বল অসামান্য ছিল। তিনি অধিরাজ বাহাদুরের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—একবার অধিরাজ বাহাদুরের অনুমতি লইবার অপেক্ষা রাখিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীর সিংহদ্বারও তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল।

এই ঘটনার এই পরিণতি হইবে, অধিরাজ বাহাদুর তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যহই মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার রমাপতি আবার ফিরিয়া আসিবে, তাঁহার তলবের অপেক্ষা রাখিবে না। কিন্তু তাহা হইল না, রমাপতি ফিরিলেন না।

এ দিকে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রমাপতির জঠরে ও ইজ্জতে রীতিমত লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে। তার উপর তখন ছেলেমেয়ে লইয়া বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময় একটী ব্যাপারে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে আর না ডাকিয়া থাকিতে পারিলেন না।

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত নর্ত্তকী ও গায়িকা বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং রাজ-বাটীতেও তাঁহার আমন্ত্রণ হইয়াছে। মুজরার দিনস্থির হইল। বাইজির ফরমাস হইল, ময়দার উপর কিংখাবের চাদর বিছাইয়া আসর করিতে হইবে। মুজরার সহিত ময়দার কি সম্পর্ক, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না—সকলেরই মাথা ঘুরিয়া গেল। অধিরাজ বাহাদুরও ঠিক করিতে পারিলেন না—গুঁড়া ময়দা, কি ঠাসা ময়দা দিয়া আসর হইবে। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য রমাপতির ডাক পড়িল। কারণ, বাইজিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে রাজসভার

গুণজ্ঞতা ও কায়দার ব্যত্যয় ঘটিবে। লোকের উপর লোক ছুটাইয়া অধিরাজ বাহাদুর রমাপতিকে আনাইলেন।

আসরের কথা উঠিতেই রমাপতি বলিলেন যে, গুঁড়া ময়দার উপর ফরাস বিছাইয়া আসর করা হউক। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, সভাস্থলেই তাহা বুঝা যাইবে, এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই। অধিরাজ বাহাদুর কিন্তু নাচঘরের অর্দ্ধেকটা গুঁড়া ময়দায় ও অর্দ্ধেকটা ঠাসা ময়দায় আসর করিবার আদেশ দিলেন। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত অধিরাজ বাহাদুর সপার্ষদে উপবেশন করিলেন—নর্ত্তকীও আসরে নামিয়াই পায়ের দ্বারা মালুম করিয়া গুঁড়া ময়দার দিকেই সদলে বসিল। গীতবাদ্য আরম্ভ হইল, নর্ত্তকীর গুণপণায় সকলেই মোহিত হইয়া গেল। অবশেষে নর্ত্তকী অপূর্ব্ব অঙ্গসঞ্চালনে নৃত্য করিতে করিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভাস্থ সকলকে সেলাম করিতে করিতে অধিরাজ বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য শেষ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অধিরাজ বাহাদুর তাহার গুণপণার তারিফ করিয়া উঠিলেন। নর্ত্তকী যেন অপ্রসন্নতার গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিজের পায়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ও হস্তখানি হতাশের ইঙ্গিতে হেলাইয়া পিছনের তালচীকে নিম্নস্বরে কহিল যে, এখানে কেহই সমঝদার নাই। রমাপতি তখনিই বাইজিকে সরিয়া যাইতে বলিয়া, ফরাস উঠাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্যেরা ফরাস উঠাইলে দেখা গেল যে, বাইজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের মৃদুগুরু আঘাতে একটী শতদল পদ্ম গুঁড়া ময়দার উপর অঙ্কিত হইয়াছে। সভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। অধিরাজ বাহাদুর বুঝিলেন, আজ শুধু রমাপতির জন্যই তাঁহার সভার ইজ্জত বজায় হইয়া গেল। সেই অবধি অধিরাজ বাহাদুর রমাপতিকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ইহাঁকে "কবীন্দ্র" উপাধি দানে বিশেষ সম্মানিত করেন।

কবীন্দ্রের কণ্ঠস্বর অতি সুললিত ছিল—যন্ত্রসহযোগে গাহিলে সকলেই যেন আকৃষ্ট হইয়াই তথায় সমবেত হইত।

কবীন্দ্রের রচনাশক্তিও অতি অসাধারণ ছিল। তিনি যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। দেবদেবীবিষয়ক ও অন্যান্য সাময়িক ঘটনা লইয়া তাঁহার অনেক সঙ্গীত পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ১২৬৯ সালে "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামে একখানি সঙ্গীতপুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানির মধ্যে অবশ্য তাঁহার সকল সঙ্গীত প্রকাশিত হয় নাই; এখনও এ দেশে তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত রহিয়াছে। পুস্তকখানিতে তাঁহার পিতা ও পিতামহের রচিত কয়েকটী পদ আছে এবং "কদ্রু কর্ত্তৃক" রচিত গীতগুলি তাঁহার পত্নী করুণাময়ী দেবীর রচিত। আমরা পরে আলোচনাকালে দেখাইব, কি ভাবের গৌরবে, কি ভাষার ছটায় কবীন্দ্রের সঙ্গীতগুলি কত উচ্চ ধরণের।

কবীন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতি মধুময় ছিল। করুণাময়ী তাঁহার অনুরূপ পত্নী ছিলেন —পতিপত্নী উভয়েই কাব্যরসে মগ্ন থাকিতেন। সঙ্গীতের রস ও রচনা লইয়া উভয়ের মধ্যে পাল্লা চলিত। করুণাময়ীর ন্যায় আদর্শ গৃহিণী পাইয়া কবীন্দ্রের জীবন চিরবসন্তময়

হইয়া উঠিয়াছিল এবং সাংসারিক অভাব অভিযোগের মধ্যেও কদাচিৎ রসোচ্ছ্বাসে ভাটা পড়িত। বাঙ্গালা ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র কবীন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

এ স্থলে কবীন্দ্রপত্নী করুণাময়ীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা না বলিয়া রাখিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শ্রীমতী করুণাময়ী বাঁকুড়া জেলার লেগো নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ গ্রামেই তাঁহার মাতুলালয় ছিল এবং তাঁহার মাতুল একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি মাতুলের নিকটেই থাকিতেন এবং তাঁহার নিকটেই করুণাময়ীর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মেধাদর্শনে মাতুল তাঁহাকে সরস্বতী বলিতেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। সংস্কৃতেও নানারূপ কবিতা লিখিয়া তিনি বর্দ্ধমান রাজসভা হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণের প্রাথমিক শিক্ষালাভও তাঁহার নিকটেই হইয়াছিল। রন্ধনেও তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি ছিল। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করিতে ভালবাসিতেন। তাৎকালিক পাকা গৃহিণীর প্রধান অঙ্গ টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ এবং বালকচিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

সঙ্গীতেও তিনি কবীন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ "মূল সঙ্গীতাদর্শে" স্থান পাইয়াছে। তিনি সেতার, এস্রাজ ও পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। কবীন্দ্রের মৃত্যুর পর বিখ্যাত সেতারী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণার বাটীতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে সেতার শুনাইয়া যাইতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বর্দ্ধমানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তাঁহার উৎসাহেই হইয়াছিল এবং পাড়ার মেয়েছেলেদিগকে তিনি ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজেও তথায় শিক্ষকতা করিতেন। বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের ১৫ই ভাদ্র করুণাময়ী পরলোক গমন করেন।

কবীন্দ্রের বংশ-লতিকা
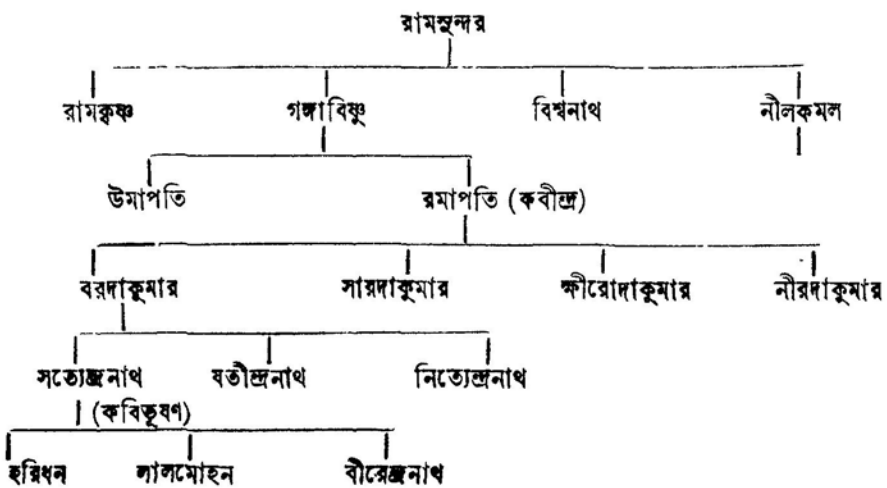
কবীন্দ্রের কাব্যকথা

সঙ্গীতের প্রাণ রস, কথা তাহার অঙ্গ ও সুর তাহার স্বচ্ছল-পেলব গতির সুচারু রেখাপাত—ভাব, ভাষা ও সুরে গান মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। এ তিনটীর অপূর্ব্ব সমাবেশ সঙ্গীতে না থাকিলে চলে না, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, কিছুরই সামঞ্জস্য থাকে না। কবীন্দ্র-প্রণীত "মূল সঙ্গীতাদর্শ" নামক পুস্তকখানিতে যে কয়টী সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ তিনের সুন্দর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতই ছিল আমাদের কবীন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ও সাধনা—সঙ্গীতের মধ্যেই ছিল তাঁহার অস্তিত্ব এবং এই সঙ্গীতেই তাঁহার পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গালা দেশে অপ্রচলিত রাগরাগিণী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার লোকান্তর গমনের পর লুপ্ত না হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষার শব্দসঙ্কট হইতে সুরগুলিকে উদ্ধার করিয়া, তিনি বঙ্গভাষার পূত মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির প্রথমাংশে এক একটী করিয়া হিন্দী গান বা তাহার "কর্‌তব্" (ইহাকে কি আজকালের স্বরগ্রাম বলা যাইতে পারে?) ও তৎপরে অবিকল সেই সুরে বাঙ্গালা গান লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে ব্রহ্ম, শ্যামা, কৃষ্ণ ও ভবানীবিষয়ক অনেক সঙ্গীত আছে এবং নানাপ্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সাময়িক ঘটনা লইয়াও কতকগুলি উপভোগ্য রচনা আছে। কি গাহিবার সময়, কি পড়িবার সময়, কবীন্দ্রের রচনাগুলি যেন আপনিই ভাসিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, জোর করিয়া টানিয়া তান মিশাইতে হয় না। কি নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে, কি কৃষ্ণ কালী ভবানীবিষয়ে, সর্ব্বত্রই গানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভাবাশ্রয় করিয়া যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের ন্যায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

উপনিষদের "নেতি" ভাবে ব্রহ্মবিষয়ে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৪নং),—

রাগ মেঘ—তাল চৌতাল।

মন সাধন কর তাঁর, যিনি হন ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর
জ্ঞানমনঅগোচর নয়ন না পায় দেখিতে।
নিরাকার নিরাধার, সর্ব্বজীবমূলাধার, নাণুস্থূল নির্ব্বিকার
রোগ শোক ন অপেক্ষতে ॥১
ন শ্যাম ন শ্বেত, ন নীল ন পীত, সত্ত্বরজস্তমত্রিগুণাতীত,
পরমব্রহ্ম সৎস্বরূপ জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত।
নক্ষত্রাদি গ্রহচয়, যাঁহার নিয়মে রয়, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত
ব্যাপিত জলে স্থলে অন্তরীক্ষেতে ॥২

আবার সত্ত্বগুণে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন (৬নং),—

কেন তাঁর উপাসনা মন কর না,
যাঁর করুণা হয় ভবভয় নিবারণ, মায়ামোহবারণকারণ

বিতরণ করেন যিনি যার যেমন মনোবাসনা।
যাঁর নিয়মে রয় চরাচর, দিবা নিশির কর, ভ্রমেন নিরন্তর
সকল গুণের আধার, যাঁর মহিমা নয় বর্ণনগোচর,
সুখময় সুধাকর জগদাধার, পরিহার মানেন বলিতে
যাঁহার গুণ রসনা॥

হোরি গানে চন্দ্রমণ্ডল অবধি ফাগ ছড়াইয়া কবি গাহিতেছেন (১০নং),—

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

নব সাজে প্যারী বিরাজে হরিষে হরিসমাজে
রঙ্গে লয়ে ব্রজরাজে।
পীতধড়া স্বীয় অঙ্গে ধরি, আপনি হইলেন বংশীধারী
সাদরে সাজায়ে কিশোরী রসরাজে
শ্যামাসখী আরো সখী সখা সাজিছে
তাল মৃদঙ্গ আরো ডম্ফ বাজিছে
রাধা ত্রিভঙ্গ শ্যাম গৌরাঙ্গ, উঠিল চন্দ্রে আবীরতরঙ্গ,
ঢাকিল রমাপতির অঙ্গ রঙ্গ মাঝে॥২

শ্রীমতীকে শ্যামের ও শ্যামকে শ্রীমতীর সাজে সাজাইয়া কবীন্দ্র, হরিসমাজে এক অপূর্ব্ব রসের সৃজন করিয়াছেন। আবার লোকলাজে সঙ্কুচিতা রাধার হইয়া গাহিতেছেন (১৬নং),—

ইমন—একতালা।

বারণ কর মনচোরেরে আসিতে সজনি।
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদি সাপিনী
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে পাছে ভাষে
মনে যাহা না জানি॥
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি
রমাপতি ভাষে কি ভয় চন্দ্রবদনি॥

এই "মনে যাহা না জানি"র মধ্যে যাহা কিছু অন্তর্নিহিত আছে, তাহা শুদ্ধ ভাবুকেরই উপলব্ধির যোগ্য।

কৃষ্ণের কালো রূপে মোহিতা রাধার ভাবে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৩৫নং),—

ভক্তাবলী কানড়া—কাওয়ালী।

কালরূপে গেল সকল,
হরিল কুল মান বঙ্কিম নয়নে বাঁশির গানে
হইল প্রাণ আকুল।

চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়া বামে,
প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে
ইচ্ছা হয় ত্রিভঙ্গ ললিত ঠামে বান্ধা থাকি চিরকাল ॥
আ মরি কিবা পীত বসন হয়েছে অঙ্গের শোভা মনলোভা
তার অভরণে নবঘনে যেন তড়িত আভা
এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে
মজিলে মন পড়িব বিরূপে
মোহন বশে যদি এ কুল নাশে
লাজ ধৈর্য্য-ধর্ম্ম থাকেন লক্ষ্মী যান বালাই
তাহে ভয় নাই
মিলাইলে বিধি নিরবধি
পাইব শ্যামনিধি
কুলেতে কি কাজ তবে কুলে থাকি হইয়া গো কুলবতী
যদি হন অনুকূল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি
ভণয়ে রমাপতি যাবে না কুল গোকুল ॥

এই গানটী সুরে, রচনায় ও ভাবে অতি সুন্দর হইয়াছে। তাই এ গানটী লইয়া একটা ব্যাপার হইয়াছিল। বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী একবার রাজবাটীতে গাহিতে আসিয়াছেন—অধিরাজ বাহাদুর সপার্ষদে শুনিতেছেন। গোবিন্দ ঐ গানটী গাহিতেছেন—অধিরাজ বাহাদুর শুনিয়া খুসি হইতেছেন, গোবিন্দকে তারিফ দিতেছেন—গোবিন্দ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকমে গাহিয়া সকলের ধন্যবাদ পাইতেছেন। অধিরাজ বাহাদুরের প্রসন্নতার কারণ, এ গানটী তাঁহারই রমাপতির রচিত এবং গানটী এত প্রসারতা লাভ করিয়াছে যে, গোবিন্দ অধিকারীর মত প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাও অপরের গান বলিয়া আসরে গাহিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। কিন্তু গানের শেষে যখন গোবিন্দ নিজের নামে ভণিতা দিলেন, তখনই ত অধিরাজ বাহাদুরের চক্ষুঃস্থির। তিনি অবাক্ হইয়া রমাপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন—মনে করিতে লাগিলেন, বুঝি বা রমাপতিই গোবিন্দের গান এত দিন স্বনামে চালাইয়া আসিতেছেন। রমাপতিও নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় গুণী লোকও এরূপ গান রচনা করিতেও ত পারেন? অধিরাজ বাহাদুর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কহিলেন, গানটী অতি পরিপাটি হইয়াছে। গোবিন্দ বিনীতভাবে উত্তর করিল,—এইখানেই, এই আসরেই সে এই গানটী সদ্য রচনা করিয়া গাহিয়াছে। অধিরাজ বাহাদুর একটু হাসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, তাহা হইতেই পারে না। এ গান যে তাঁহার সভায় তিন চারি বৎসর চলিয়া আসিতেছে আর ইহার রচয়িতা তাঁহারই সভাসদ কবীন্দ্র রমাপতি। কবীন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, সুচতুর গোবিন্দ তাঁহার

পদধূলি লইয়া, আসরে ফিরিয়া গিয়া কবীন্দ্রের ভণিতা দিয়া গানটী পুনরায় গাহিয়া দিলেন।

কবীন্দ্রের রচিত প্রত্যেক গানেই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। তাৎকালিক কবিগণ উৎকৃষ্ট শব্দ-বিন্যাস, অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষাদি শব্দালঙ্কারের অত্যধিক সমাদর করিতেন। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনার মধ্যে অনুপ্রাস শ্লেষ ইত্যাদির অজস্র ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ রচনায় অর্থ-নিষ্কাশন কঠিন হইয়া উঠে, এক এক সময় অলঙ্কার রক্ষা করিতে গিয়া অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়া যায়। কবীন্দ্রের যে এরূপ বিচ্যুতি ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। উদাহরণস্বরূপ শ্যামাবিষয়ক এই গানটী (৩০নং) উদ্ধৃত হইল।

দেশমল্লার—ঢিমে তেতালা।

কে নাচিছে সমরে বামা লাজ না সম্বরে
সুবেশা যুবতী সুলজ্জিতা রূপবতী সতী দাঁড়াইয়া বেষ্টিতা অমরে।
গোরা নহেন সাপক্ষ, রথির নাহি সাপেক্ষ, শবাসনে সাধে স্ববাসনা,
বক্ষে দাঁড়ায়ে কম্পাণি, ভূমে পড়ে শূলপাণি, সুরেশ্বরী যাঁর শিরোপরে॥১
সহর বিরাজে রণে, সিহরে বীরা যে রণে, কি সাহসে যুঝিছে সহাসে,
যে বল ধরে অবলা, বর্ণনে না যায় বলা, মহাবল শমন যায় ডরে॥২ ইত্যাদি

এ স্থলে "গোরা" শব্দের অর্থ ভাল বুঝা যায় না। মনে হয়, গোরা সৈন্যের প্রভাব ও প্রতাপের কথা তৎকালে খুব প্রচারিত ছিল এবং সেহেন গোরার সাহায্য না লইয়াও দেবীকে যুদ্ধে জয়ী দেখান হইয়াছে। সুতরাং গোরার যখন উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে "কম্পাণি'' ও "সহরের"ও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। 'কম্পাণি' ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ও 'সহর' কলিকাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এ দিকে কিন্তু দেবীপক্ষেও "কম্পাণি" শব্দে (কং নরমুণ্ডং পাণৌ যস্যাঃ) নরমুণ্ডধারিণী ও "সহর" হরের সহিত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এরূপ রচনায় কাব্যের কতদূর উৎকর্ষ হয়, বলা যায় না; কিন্তু প্রাচীন কবিদের এরূপ শব্দ-খেয়াল বিরল নহে।

যমকের পারিপাট্যে এ রচনাটি অতি উৎকৃষ্ট। গঙ্গা ও অন্নপূর্ণার আশ্রয় লইতে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৮২ নং),—

বাগেশ্রী—আড়া।

এখন বাসনা করি, এখানে বাস না করি, সমাধি হইগো শিবে।
আমার অশিবে বিনা শিবে কেবা বিনাশিবে
যথা উপাসনাশয় তথা উপাস না সয়
করিয়াছি পূর্ণাশয়, লব অন্নপূর্ণাশ্রয়।

কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গানীরাহার, কালদণ্ড দুর্নিবার
অনিবার নিবারিবে ॥
ত্যজি সংসার সং-সার, করিব সৎসঙ্গ সার
বিপদে শ্রীপদ সার, অন্য সকলি অসার ;
শিববাক্যেতে মন দেহ, ইথে করো না সন্দেহ, রমার এ পাপ দেহ
শেষে গঙ্গাতে ভাসিবে ॥

অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব এই রচনাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিবার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৩০ নং),—

খাম্বাজ—চৌতাল।

পীতবসন নীলকায়, বহিছে মন্দ অনিল তায়
রূপ জলদ বিদ্যুল্লতায়, করিয়াছে বিমোহিত মহীতে।
আহা মরি মন হরে মণিহারে, তার শ্রেণী হেরে বকশ্রেণী হারে,
দিবারে নারি উপমা সে নীহারে, সেই অবনত এ অবনীতে ॥
কপোল দীপ্ত আলোক অলকে, মোহিত হতেছে ত্রিলোক তিলকে,
হেরে মন হয় পুলক পলকে, মজায় অপাঙ্গভঙ্গিতে,—
সঙ্গে যুবতী কিবা রূপবতী, তাহার রূপের তুলে রতি রতি
ও পদপ্রান্তে রেখ ব্রজপতি, গতিহীন রমাপতি পতিতে ॥

কেবলমাত্র ভাষার পারিপাট্যে নহে, ভাববৈচিত্র্যেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি নায়িকার মনোহর বর্ণনা পাওয়া যায়। বিস্তৃতিভয়ে এখানে উল্লেখ করিলাম না।

সাময়িক ঘটনার সরস বর্ণনায় কবীন্দ্র যেন সিদ্ধহস্ত। বিধবাবিবাহ, প্রেমরা খেলা, রেলগাড়ী, লাইব্রেরি (মেট্‌কাফ হল), টেলিগ্রাফ, বর্দ্ধমানরাজের নবনির্ম্মিত কাছারি-বাটী প্রভৃতির বর্ণনা শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ আনন্দ দান করে এবং বর্ণনার উৎকর্ষতায় ঘটনাগুলি যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের মত সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। বিধবাবিবাহে (১৪৭ নং) গাহিয়াছেন,—

বিভাস—আড়খেমটা।

যে তরঙ্গ উঠেছে বিদ্যাসাগরে
কত রঙ্গ হবে নগরে।
আদৌ প্রেমামৃত, বদনচন্দ্রাকৃত, লাবণ্যলক্ষ্মীযুত,
হবে উদ্ভব কুচ ঐরাবত বিধবারূপ রত্নাকরে ॥
এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাপ্ত কোরে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার বেগ গেল ইংলণ্ড,

যে এ পক্ষেতে রত পায় অমৃত, বিষ হতেছে পক্ষান্তরে ॥
শুনিতেছি অদ্যাবধি, মন্থন বারিধি, সে দেবাসুরের বিধি ;
এতে দেব বিরোধী নিরবধি, কেবল যা করিবেন ঈশ্বরে ॥
ঈশ্বর যাতে অনুকূল, দেব তাতেই প্রতিকূল, এ বিবাদের এই মূল ;
কোরে গুণবিধান দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাশরে ॥
দেখ্‌চি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে, সাপক্ষ আছেন অনেকে ;
বিধবা সহাস্যে আছে বসে, হাত দিয়ে কজ্জলাধারে।
দেখে ভাসে রঃ পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ সম্ভব কি অসম্ভব,
বিচারানুসারে হলে পরে আগে দেখিব পরে পরে ॥

দেব বিরোধী, দেব প্রতিকূল—স্বর্গীয় স্তব রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। কাজলনাতা লইয়া বিধবা বসিয়া আছেন, এ দৃশ্যটী তৎকালের সমর্থক দলকে কিরূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহা দেখিবার বিষয়। এরূপে তাঁহার সাময়িক গানগুলি বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য।

একটী গানে তিনি খোসের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (১৫১ নং),—

ভীমপলাসী—মধ্যমান।

এতো কি যন্ত্রণা দিতে হয় ওহে দয়াময়।
নহে খোসের সময়, অঙ্গ খোসে রস-ময় ॥
দিলেন খল ব্যাধি বিধি, দুঃখের নাহি অবধি,
নখাঘাত নিরবধি, না করিলে নয়।
শয়ন অতি সন্তর্পণ, সেবন খর-তপন,
নাহি জানি কতো পণ, অঙ্গেতে ক্ষত উদয় ॥
শয্যা হয়েছে ঐশ্বর্য্য, নির্লজ্জ অম্বর বাহ্য,
রোদন করে না গ্রাহ্য, শুন পরিচয়।
দিবনিশি হায় হায়, পড়ে আছি নিঃসহায়
রমাপতির সহায়, প্রভু নিত্য নিরাময় ॥

খোসে যিনি ভুগিয়াছেন, এ গানের প্রত্যেক কথাটি তাঁহার বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকথিত দীক্ষার জন্য চাকুরি ত্যাগ করিয়া করুণাময়ীকে ডাকিয়া কহিতেছেন (৯০নং),—

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান চল মন আমার,
গমনে সুগম অতি মুহূর্ত্তেক ব্যবধান।
কেন মজি হলাহলে, কলহাদি কোলাহলে,
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জ্জন স্থান ॥

সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন,
কর শয্যা তৃণাসন, কাষ্ঠাদির উপাধান।
ইথে করো না সন্দেহ, আত্মযোগেতে মন দেহ,
পঞ্চরত্নাবৃত দেহ মৃত্যুঞ্জয়ে কর দান॥
হোতাচার্য্যে রাখ বলে, সমাংস আহুতি হলে,
কর্ম্মকুম্ভ শান্তিজলে, মৃড়াগ্নি করে নির্ব্বাণ॥
দীন রমাপতি কয় দিনগত পাপক্ষয়,
করুণাময়ীরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান॥

অভাবের তাড়নায় কবীন্দ্র "লগনের চন্দ্র" অধিরাজ বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন (১৫২ নং),—

আহার বিহনে শীর্ণ হলো পরিবার।
বিশেষতঃ বসন নাহিক পরিবার॥
বাসের কষ্টেতে বসে রজনী পোহাই।
নিদ্রাবশে অলসে সঘনে উঠে হাই॥
এখন করি কি কন কহিলে কারকে।
সকাতরে তার তরে কহি বিচারকে॥
ঘরমধ্যে বসে হেরি গগনের চন্দ্র।
কে খণ্ডিবে ইহা বিনা লগনের চন্দ্র॥

ইহার পর "সঙ্কেত পত্রিকা"য় (১৫৩ নং) আরও বিশদভাবে দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কবীন্দ্র, মানবজীবনের সাতটী বিভিন্ন অবস্থার কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতটী পাঠ করিলে মহাকবি সেক্ষপীয়রের As You Like It নাটকের Seven Stages of Life শীর্ষক উক্তিটী মনে হয়। অবশ্য একটী অন্যটির প্রতিবিম্ব নহে, তবুও স্থানে স্থানে বেশ ঐক্য দেখা যায়। কবীন্দ্র গাহিতেছেন (১৪৪ নং),—

খাম্বাজ—একতালা।

কেমন কপাল, শুন হে কৃপাল, গেল কাল টানাটানিতে।
বলতে নাহি সরে মুখ, কারে বলে সুখ, কিছু নারিলাম জানিতে॥
দেখি নাক জ্ঞানে, কিন্তু লয় মনে, আদ্য টানাটানি সূতিকাভবনে,
দ্বিতীয়েতে টানাটানি স্তন পানে, শুনিয়াছি কানাকানিতে॥
তৃতীয়েতে অধ্যাপক টানাটানি, আর বালকের সনে হানাহানি,
জানাজানি তারা না মানে কখনি, গুরুমহাশয়বাণীতে॥
চতুর্থেতে টানাটানি এইবার, স্ত্রীপুত্রাদি লয়ে গৃহ পরিবার,
বসনভূষণ আদি অলঙ্কার হলো পার মহাজনিতে॥

পঞ্চমেতে হলো রাজার শোষণী, ঘরের কবাট ধরে টানাটানি,
এই পাপটানে হলো ধর্ম্মে হানি, পুত্র বিরত জানিতে ॥
ষষ্ঠেতে টানয়ে এ দিকে শমন, অপর দিকেতে টানে বন্ধুজন,
সপ্তমেতে হলে দেহ বিসর্জ্জন, টানিবেক নানা প্রাণীতে ॥ ইত্যাদি।

মহাকবি এইরূপ বলিয়াছেন,—(Act II, Sc. vii)

"At first the infant,
Mewling and puking in the nurse's arms.
Then the whining school-boy, with his satchel,
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the canon's mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lined,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances ;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon,
With spectacles on nose, and pouch on side ;
* * Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything."

কবীন্দ্র ইংরাজী জানিতেন না; সুতরাং সাদৃশ্যটী বিস্ময়জনক। ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর সহিত ইঁহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহার শব্দচাতুর্য্য, ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলত ইঁহার কবিতার অনেক স্থলে দেখা যায়। কবি ব্রাউনিংএর ন্যায় ইনিও কবি-পত্নী লাভ করিয়াছিলেন।

কবীন্দ্রের আগমনী গীতগুলি আজিও বৈষ্ণব ভিখারিরা গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়। তিনি যে অনুবাদকুশল ছিলেন, তাহা "মূল সঙ্গীতাদর্শ" পুস্তকের ৫৪, ৫৫, ৭১,

৭২, ৭৫ ও ৭৬ সংখ্যক গীতগুলি পড়িলেই জানা যাইবে যে, কিরূপ ছত্রে ছত্রে সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও কবিতা হইতে কবির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু দিনের আলোক যেমন রন্ধ্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্ধকার গৃহস্থিত ব্যক্তিকে দিনের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দেয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কবীন্দ্রকে বিশদভাবে প্রকট না করিলেও তাঁহার কবিত্বের উচ্চতা ও সারবত্তা জানাইয়া দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কবীন্দ্র আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ও স্বরচিত। তাঁহার এই যৎকিঞ্চিৎ কাব্যাংশ যে প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব ও ভাষা বিশুদ্ধরূপে বজায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কবীন্দ্রপত্নী করুণাময়ী দেবী যে সঙ্গীতকুশলা ও রচনানিপুণা ছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। জীবনের নশ্বরত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার গানগুলিতে বেশ পরিলক্ষিত হয়। সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি গাহিতেছেন (১১১নং),—

সুরট মল্লার—মধ্যমান।

মন আর মিছে কর অভিমান।
ভবপার বড় ভার জান না সন্ধান॥
দেহ হবে ছিন্ন ভিন্ন, গৃহাদি হবে অরণ্য,
সঙ্গী কেহ নহে অন্য, একা হবে প্রাণ॥
তুমি বা কে কে তোমার, তুমি দুঃখ ভাব কার,
ত্রিভুবন অন্ধকার, মুদিলে নয়ন।
এই যুক্তি সার কর, তারিণীচরণ ধর,
যাহাতে ভবসাগর পাবে পরিত্রাণ॥
সাংসারিক কর্ম্ম সব, অনিত্য মায়ায়োদ্ভব,
সব ত্যজি ভাব শিব উক্তি গুণগান।
ভক্তি ভাবে দুর্গা বল, না ভাবিহ কালাকাল,
করুণার হবে সফল, জনম নিদান॥

অন্তিমের জন্য জগদম্বাকে জানাইতেছেন (১১২নং),—

সুরটমল্লার—মধ্যমান।

জগদম্বে তব মনে আছে গো কত।
সদা প্রাণ সশঙ্কিত কর যা হয় উচিত॥
অসাধ্য সাধনা যত, সকলি তোমার হাত।
এ দীনে করিতে মুক্ত, ভার কি হয়েছে এত॥

তিন জগতের সার, ও পদে রেণু যার।
এ পাপী আত্মাতে তার, কেন বা এত বিরত ॥
বুঝি কৃপণ প্রকাশে, কিম্বা ছলনা আভাসে,
কিম্বা মম কর্ম্মদোষে, হলো না সম্মত ॥
অন্তে সহ মৃত্যুঞ্জয়, উভয়ে হয়ে উদয়,
করুণারে বিতরিও, করুণাধন কিঞ্চিত ॥

এরূপে তাঁহার প্রত্যেক গান সুন্দর সরল ভাষায় রচিত হইয়া হৃদয়ের সরল ভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছে। কখন কখনও কবীন্দ্রের গানের উত্তর ঠিক সেই সুরে ও তালে, কিন্তু বিপরীত বিষয় বর্ণনায় দিয়াছেন। শবদর্শনে কবীন্দ্র যাহা গাহিলেন (৮৭নং), সন্তান জন্ম উপলক্ষ্য করিয়া তাহার বিপরীত দৃশ্য করুণাময়ী (৮৮ নং) গাহিয়াছেন।

কবিদম্পতির নিম্নলিখিত গান দুইটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীরাধা বেশভূষায় সাজ্জিত হইয়া শ্যামের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, কিন্তু শ্যাম-সমাগমের সকল আশাই প্রভাতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইতেছে, এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবীন্দ্র বেহাগে গাহিলেন,—

সখি শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ককিরণ, উষার প্রভায় হলো সংকীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ, কুসুমেরি হার শুখালো—
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়, কুমুদিনী হাস্য বদন লুকাল ॥
বিহঙ্গমগণ করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন, বুঝি বিধি ঘটাল,—
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়,
দেখ বৃক্ষচয় হলো অশ্রুময়, শর্ব্বরী সুখবিলাস ফুরাল ॥

রমাপতির এ গানে করুণাময়ী বিরহবিধুরা রাধার এই বিসদৃশ অবস্থা সহিতে না পারিয়াই যেন শ্যামের শুভাগমন-সংবাদে শ্রীরাধাকে উল্লসিত করিয়া গাহিতেছেন,—

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপঝঙ্কারে, কোকিলের সুরে গগন ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,স্পন্দন করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল ॥

মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিহরে বিরহে প্রণয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত, তারে কে শিখাল,—
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি, জলদে জলদে বলিয়া অমনি,
আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী, সজনি পোহাইল ॥
ফলিল তাহার আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কালে বিধুরে পাইল,
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়, নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ-নিশির ভোগ ফুরাইল ॥

উপরিউক্ত দুইটি গান মূল সঙ্গীতাদর্শে স্থান পায় নাই, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী রচনা। একজন বৃদ্ধের নিকট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমাদের এ দেশে এই গান দুইটি পার্ব্বতী পরমেশ্বরের ন্যায় করুণা ও রমাপতিকে একত্রে অবিচ্ছিন্নে প্রতীয়মান রাখিয়াছে। তাঁহার আগমনী গীতগুলিও মেয়ের জন্য মায়ের প্রাণের আবেগে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে।

পরিশেষে আমার নিবেদন যে, কবীন্দ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে আমাদের এই আলোচনার সুযোগই হইত না। সত্যেন্দ্র বাবুই তাঁহাদের পৈতৃক বসতবাটীতে এখনও যাতায়াত করিয়া থাকেন। তিনি বর্দ্ধমানের অধিরাজ প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কবীন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ।

১

পরজ একতালা।

কেশব আমায় কর হে পার।
তোমা বিনা ভবে আর কে আছে আমার ॥
আমার নাহি কিছু পুণ্য, পূর্ব্ব পুণ্য শূন্য,
পাপাত্মার পাপ, পাপে পরিপূর্ণ,
নিলাম হে শরণ, যা কর চৈতন্য,
সকলি হরি হে তোমারি ভার ॥
আমি শুনেছি শ্রবণে, ভাগবত পুরাণে,
অহল্যা মানবী ঐ চরণের গুণে,
ধীবরের তরী, স্বর্ণ করিলে হরি, রাখিতে ঘোষণা জগতে,—
(যেমন) ধ্রুব যায় বন, করিতে সাধন,
সঙ্গে তুমি হরি, করিলে গমন,
রমাপতির মন, ঐ শ্রীচরণ চরণেতে স্থান দাও হে এবার ॥

ভক্তি ভাবে যেই ভাবে তব পদ·
থাকে না তাহার বিষাদ বিপদ,
সতত প্রসাদ প্রমোদ আহ্লাদ, তাই পদাশ্রিত রহিল তোমার ॥

২

কে নাচিছে রণরঙ্গিনী
নবজলধরবরণী, করে লয়ে অসি, ওমা মুক্তকেশী
হাসি হাসি নাশে দানব অমনি ॥
বামা বয়সে নবীনে, অথচ প্রবীণে
কুলবতী বামা দুকূলবিহীনে
হুঙ্কার শ্রবণে, ভয়ে মরি প্রাণে, অথচ যে বামা ভুবনমোহিনী ॥
(বামার) তৃতীয় নয়ন প্রচণ্ড তপন
দহে রিপুগণ যেন হুতাশন,
রমাপতির মন আনন্দে মগন, প্রেমে পুলকিত স্মৃতি সরোজিনী ॥

৩

আগমনী।
যাও গিরি ত্বরা করি আনিতে উমারে।
আর কি হেরিব না গো প্রাণের কন্যারে॥
বৎসর হইল পূর্ণা, আনিবারে অন্নপূর্ণা,
কেনই বা মনে কর না, কি ঐশ্বর্য্য ভরে॥
তোমারে কত কহিব, জান ত জামাতা ভব,
স্বভাবে পাগল ভাব, কে তুষিবে মায়েরে,—
উমা যে কহিয়ে গেল, কবে আর আনিবে বল.
বিস্মৃত হলে সকল, আমার কপাল ফেরে॥
(উমার) আসিতে হয়েছে মন, পথ করে নিরীক্ষণ.
তাহাতেই মার প্রাণ সদাই বিদরে,—
করুণা বিনয় করি, কহে গিরির পদে ধরি,
যাত্রা কর শীঘ্র করি, শিবের কৈলাস পুরে॥

৪

শুধুই গো তোমারি রাণি, বিষাদ বলিয়া নয়,
উমার বিচ্ছেদে দেখ বিষাদ বিশ্বময়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে

উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥
দেখ দেখি তরুগণ, সবে আনত বদন,
বিষাদ ভরেতে যেন পৃথ্বীগত হয়,—
আকাশেরো তারাগণ, শিশির রূপেতে যেন
করে অশ্রু বিসর্জ্জন, নিশীথে ধরায় ॥
আর দেখ ধরাধর, ঝরিতেছে অশ্রুধার,
অনিবার হৃদে তার, বিচ্ছেদ না যায়, —
বমাপতির এই মনে, হরপার্ব্বতীরে এনে,
সফল করি নয়নে, হেরে তাহাদেব উভয় ॥

৫

বেহাগ একতাল।

কব কি গিরিবব

প্রাণেরি নন্দিনী জনমদুঃখিনী, বারেক তাহারে মনে নাহি কর।
না জানি কি ভাবে মনেতে ভাবিলে,
সোনাব প্রতিমা পাগলেরে দিলে,
দুহিতা বলিয়ে তত্ত্ব না করিলে, পাষাণে বাঁধিয়া অন্তর ॥
নিশীথে শয়নে ছিলাম যখন,
হেরিলাম আমি অতি কুস্বপন,
তদবধি মম স্থির নহে মন, কাতর যে নিরন্তর,—
সে মুখকমল মলিন অতি,
চলিবার আর নাহিক শকতি,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগেন ভগবতী, ক্ষুধাতে হইয়ে কাতর ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা জরাজীর্ণ বাসে,
অবশেষে উমা আসে মম পাশে,
কিছু খেতে দে মা বলে উমা ভাষে, ধরে দুটি মম কর ;
ক্ষীর সর ননী লয়ে সযতনে,
দিতেছিলাম আমি উমারি বদনে,
রমাপতি ভণে নিদ্রাভঙ্গ সনে, চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥

৬

ভৈরবী।

কবে আর আনবে গিরি গৌরীরে আমার ঘরে।

বাছারে না হেরে আমার, প্রাণ যে কেমন করে ॥
সম্বৎসর গত হল, বারেকও না আনা হল,
মায়ের প্রাণে সইবে কত বল,—
তনয়া জামাতা ঘরে, রয়েছে বৎসর ধরে,
করুণার মাথার কিরে, আনগে তিন দিনের তরে ॥

ইহা ছাড়া আরও অনেক গান পাওয়া যায়, যাহা রমাপতির রচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তাহাতে ভণিতা না থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"*

পদাবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত, রসশাস্ত্রে সুরসিক, ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমশ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' নাম দিয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বহু কবির অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কতকগুলি পদ, পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেক পদের সংশোধিত পাঠান্তর, 'অভিরাম' প্রভৃতি আটাশ জন নূতন কবির অনেকগুলি পদ এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজন কবির কয়েকটী পদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ এই গ্রন্থের কিরূপ সমাদর করিয়াছেন, বলিতে পারি না; তবে রায় মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, রসজ্ঞতা ও বিচারণার পরিচয় দিয়াছেন, পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার ধারায় তাহা অভিনব, এ কথা বোধ হয় জোর করিয়াই বলিতে পারি।

১। পদরত্নাবলীর ভূমিকায় বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। "কবিশেখর," "চম্পতি," "ভূপতি," "বল্লভ" প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত বহু পদ আমরাও পাইয়াছি; সেগুলি বিদ্যাপতির নামে গ্রহণ করিলে, সুবিচার হইবে বলিয়া মনে হয় না। রায়শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে আমরা 'কবিশেখর' ভণিতা পাইয়াছি। 'শেখরদাস' ভণিতাও আছে।

"অখিল লোচন তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দকন্দে"

এবং

"কি করব জপ তপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে"

পদ দুইটী আমরা "চম্পতিপতি" ও "চম্পতি" ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। আবার—

"মদন কুঞ্জ ত্যজি চলল চতুর দূতি
বকুল কুঞ্জে চলি গেল"
"সখি হে বুঝি কহসি কটু ভাষা"

এবং

"রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
মিলল কানুক-পাশে"

ইত্যাদি গান "ভূপতিনাথে"র ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে। "বল্লভদাস", কেবল "বল্লভ"

---

* ১৩৩২, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এবং "হরিবল্লভ" ও "রাধাবল্লভ" ভণিতারও বহু পদ রহিয়াছে। এগুলিকে কোন মতেই বিদ্যাপতির বলিতে পারা যায় না।

আমরা নিম্নে রাধাবল্লভের ভণিতাযুক্ত একটী নূতন ধরণের পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নাই রূপ নাই লেখা কার সুত কার সখা
তিঁহো কৃষ্ণ কোথা তার স্থান।
ত্রিদশের পিতা কেবা আত্মা কৈল কার সেবা
কোন কৃষ্ণ উলুকবাহন॥
নাগশয্যা কেবা কৈল বামন অর্থ কেবা হইল
কোন কৃষ্ণ হৈল ধানকী।
বানর সকল সনে কে বধিল দশাননে
কোন কৃষ্ণ তারিল জানকী॥
কেবা বাসুদেবের বালা * * * *
কেবা হইল ব্রহ্মঋষি মুনি।
অক্রুর আনিল কারে কে বধিল কংসাসুরে
কার ভাবে কান্দেন গোপিনী॥
কেবা রাধিকার সুত ব্রজে হইলা অদভুত
কোন কৃষ্ণ শ্রীদামের মাঝে॥
* * * * * * * *
* * * *
নির্জ্জন তার পরে সমরে বধিল কারে
তখন রাধিকা ছিল কোথা।
হরে কৃষ্ণ নামে নামে কে দিল যোগাদ্যা ধামে
মধ্যখানে তিহো কার সুতা॥
কেবা নবদ্বীপে আসি শচীগর্ভে পরকাশি
নাম কৈল বত্রিশ অক্ষরে।
এক নামে * * শ্রীরাধাবল্লভে ভণে
বৈরাগ্য বলিয়ে যুগান্তরে॥

২। পদরত্নাবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা ইতিপূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" (১৩২৯ পৌষ) পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন বটে (১৩২৯ চৈত্র), কিন্তু তাহাতে আমাদের সন্দেহ দূর হয় নাই।[1]

১। ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে আমরা এই সন্দেহ জানাইয়া বিষয়টীর পুনরালোচনা করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় আর তাহার উত্তর দেন নাই।

চণ্ডীদাসের কয়েকটী নূতন গান আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভারতবর্ষে (ভাদ্র ১৩৩১) তাঁহার দুই একটী গান ও আমাদের এই সন্দেহের কথা পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্য সেই একটী গান এখানেও প্রকাশিত হইল। এই গানটীর প্রথম চারিটী চরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। আমাদের সংগ্রহের মধ্যে চরিতামৃতের দুইটী পদের উল্লেখে —

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর" ॥
(শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যস্য নৃত্যপদং)

এবং

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ" ॥
(শান্তিপুরে মুকুন্দস্য নৃত্যপদং)

এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পদ দুইটী প্রাচীন মহাজনের পদ। প্রথমটী যে বিদ্যাপতির, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পদটী কাহার, এত দিন তাহা জানা ছিল না। সম্প্রতি আমরা চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয় পদটী সম্পূর্ণ পাইয়াছি,—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে ॥
দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাই তাহা উড়ি যাই ॥
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনমদুখিনী ॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, চণ্ডীদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর আস্বাদিত গানই পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, উপরিউক্ত পদ হইতে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের অনেক গানেই উপরিউক্ত গানের সুর ধ্বনিত হইতেছে। আমরাও এই সুরেরই অনেকগুলি নূতন গান পাইয়াছি, সুতরাং পদাবলীর চণ্ডীদাস যে

মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার গানই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, এবং পরবর্ত্তী সংগ্রহগ্রন্থেও তাঁহারই গান সংগৃহীত রহিয়াছে, ইহা বেশ ভালরূপেই প্রমাণিত হইতেছে। রায় মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাসের অনেক গানে অন্য কবির ভণিতা দেখিয়াই সেই নামেই ছাপাইয়া দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদ্যাপতির গান লইয়া যেরূপ বিচার করিয়া প্রকৃত রচয়িতা স্থির করিয়াছেন, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সেরূপ কিছু করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে, পদাবলীর চণ্ডীদাস জাল! (এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় নিবেদন করিয়াছি)। পদরস-সার অথবা পদরত্নাকরে থাকিলেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, অন্ততঃ এ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা হওয়া উচিত ছিল।

৩। রায়শেখর, চন্দ্রশেখর, এবং শশিশেখরের ভণিতাযুক্ত পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গানই পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁদের অনেক গান প্রায় সকল কীর্ত্তনীয়াগণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে (১৭৭১ শকাব্দায়) "পদ-কল্পলতিকা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের মলাটে লিখিত আছে (বানান অবিকল রাখিলাম),—

পদকল্পলতিকা।

ফলতঃ

প্রাচিন পদ কর্ত্তা মহাশয়গণ রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ

সম্প্রতি

শ্রীযুত গৌর মোহন দাস

দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতার রাজেন্দ্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল॥

শকাব্দা ১৭৭১

এই পুস্তকখানিতেও শেখর কবিগণের অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। আমরা শশি-শেখরের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম।

"ইয়াদী কীর্ত্তি গুণসমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধা।
সদুদারস্ত চরিত তস্য পুরাহ মম সাধা॥
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরী।
কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং লিখনং সুকুমারী॥
ঠামহি তব প্রেম দুর্ল্লভ লইনু কর্জ্জ করি।

ইহার লভ্য পাইব দিব্য প্রেম অখিল ভরি ॥
একুনে তিন বাঞ্ছা পূরণ পরিশোধ কলিযুগে।
ইহার সাক্ষি ললিতা সখি শত মঞ্জরী ভাগে ॥
তারিখ তস্য দ্বাপরস্য শশিশেখরে লিখিলাম।
করুণা করহে রাধে প্যারী এই খত লিখি দিলাম ॥"

"রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে" পদটী পদরত্নাবলীতে "বদনের" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, এই পদটী স্বর্গীয় রসিকদাস কীর্ত্তনীয়ার মুখে আমরা "শেখরের" বলিয়া শুনিয়াছি। "বঙ্গবাসী"র সংগৃহীত "সংগীতসারসংগ্রহে"ও এই পদটী শেখরের ভণিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি জানা গেল তুয়া চরিতে।
* * * *
গত রাত্রৌ যদভূন্মম দুঃখং শৃণ্ সরলে।
বধিরে হম কিয়ে শুনায়সি তাহে শুনায়বি বিরলে ॥
* * * *
কোপং ত্যজ পদমর্পয় মৃদুকিশলয়শয়নে।
তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে ফিরি যাহ তার সদনে ॥
* * * *

এই ধরণের পদ প্রায় শেখরকবিগণেরই নিজস্ব, ইহা বদনের কিরূপে হইবে? পদ-রত্নাবলীতে দুইবার "গুণনিধি বট" কথা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় চরণের আমাদের উদ্ধৃত পাঠান্তরটী সংগত বলিয়া মনে হয়। গানের শেষে ভণিতা এইরূপ,—

"শান্তিং কুরু দন্তৈর্দংশ
কোপং ত্যজ রুচিরে।
তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে
সুখ পাবে কহে শেখরে ॥"

৪। যদুনাথের সুবল-মিলনের যে পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া পদরত্নাবলীতে সংগৃহীত হয় নাই, আমরা সেগুলি পাইয়াছি,—অন্ততঃ সেই ধরণের পদ। একটী পদ ও পদাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

(ক) "সুবলে করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে রসময় বিদগধ শ্যাম।
রাধাকুণ্ডতীরে আসি কুসুমকাননে বসি শোভা দেখে অতি অনুপাম ॥
বৃন্দাদেবী হেন কালে আসি সেই স্থানে মিলে চম্পক কুসুম করে করি।
সুবলেরে সমর্পিল তিঁহো কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্দীপনে রাধার মাধুরী ॥

প্রেমে চতুর্দ্দিগে চায় অরুণ লোচন তায় পুলকে পুরিল প্রতি অঙ্গ।
ধরিয়া সুবলের করে কহে গদগদস্বরে মিলাইয়া দেরে রাইএর সঙ্গ॥
শূন্য হেরি সর্ব্বক্ষণ তাঁহা বিনে বৃন্দাবন মোর মন তাহার ধিয়ানে।
যদি নাহি আসে প্যারি রাধা রাধা রাধা বলি যদুনাথ ত্যজিবে পরাণে॥

এই গানের পর—

(খ) রাধা রাধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে।
বাহু পসারিয়া সুবল শ্যাম নিল কোলে॥

এই কলি দুইটী আছে। তাহার পর "তুক গান" আরম্ভ হইয়াছে। যথা,—

'গা তোল রে চূড়াধারী। বনে নাই তোর রাধা প্যারী॥
হায় আমি কি করিলাম। কেনে রাধার কুঞ্জে এলাম॥
চাঁপার ফুল তোর হাতে দিলাম।
প্যারী মনে পড়াইলাম॥ ইত্যাদি

তার পর আছে,—

ধীরে ধীরে রাধার নাম জপে কৃষ্ণকানে।
রাইনাম পরশিতে পাইল চেতনে॥

আবার তুক গান; শেষে ভণিতা এইরূপ,—

রাধা আনি দিব সুবল বলিল।
যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥

৫। শ্যামানন্দ, শ্যামচাঁদ, শ্যামদাস ও জগদানন্দের পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। জগদানন্দের আক্ষেপ অনুরাগের যে পদটী পদরত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম চরণটী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। যে কবি জগদানন্দ পরবর্ত্তী কবিদের সুবিধার জন্য 'অমল' 'বিমল' 'কোমল' 'কমল' ইত্যাদি মিলাত্মক শব্দের অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি যে "কেন গেলাম জল ভরিবারে,............ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে," এইরূপ মিল করিবেন, এ বিষয়ে রায় মহাশয়ের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আমরা ইহার পাঠান্তর পাইয়াছি,—

"সই কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধছলে কদম্বের তলে॥"

পদরত্নাবলীতে গোবিন্দদাসের "হোর কি দেখিগো বড়াই কদম্বের তলে" এই গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং জগন্নাথের পদের মধ্যে "বড়াই হোর দেখ রঙ্গ চায়্যা" এই গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা জগন্নাথের "হোর কি দেখিয়ে গো বড়াই কদম্বের তলে" এই শীর্ষক একটি গান পাইয়াছি। বংশীবদনেরও একটি গানের প্রথম চরণটী এইরূপ, পরে উদ্ধৃত করিব।

ঠাকুর নরোত্তমেরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। বংশীবদনের বলিয়া "দানলীলার" (পদরত্নাবলী, ৩৬৯ সংখ্যক পদ) যে পদটি পদ-রত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পদটি গোবিন্দ-দাসের। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশদাসের মুখে "দান গানে" গোবিন্দ দাসের এই পদ বহুবার শুনিয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পুথি হইতে গানটী অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

এইমনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজবালা সনে, কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচার নাহি কর ডর, ঘনাইয়া আসিছ কাছে।
গুরু বর আগে করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ বেণীবদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী ব্রাহ্মণে করাহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ, না কর ঐছন ঢঙ্গ।
যেই নাগরী ও রসে আগরী, করহ তাকর সঙ্গ॥

এই গানের চতুর্থ চরণে "কাচের পুতলী সোনার বরণে ছুঁইলে বদলে পাছে" কোন কোন কীর্ত্তনীয়ার মুখে এইরূপ পাঠান্তর শুনিয়াছি। পদরত্নাবলীর বংশীবদনের পদটীতে ছন্দেরও মিল নাই, লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদীতে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পদের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ গোবিন্দ দাসেরই আর একটী পদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

তোঁহারি হৃদয়, বেণীবদরিকাশ্রম উন্নত কুচগিরি জোর।
সুন্দর বদনছবি কনক ধূম পিবি ততহি তপত জীউ মোর॥
সুন্দরী তোঁহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গোরী আরাধনে কাঁহা চলি যাওব তুঁহু সে তিরথময়ী গোরী।
সুন্দর সিন্দুর মৃগমদ পরশল এহি সুরযগ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ দ্বিজরাজহি সোঁপলু সুন্দরী সহস্র পরাণী॥
কামসায়রে পুনঃ সহজই নিমগন কাম পুরবী তুঁহু রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

বংশীবদন, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, অনন্তদাস, বংশীদাস, প্রেমদাস, রামচন্দ্র, গিরিধর, নরহরি, বল্লভদাস প্রভৃতির বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পদের পাঠান্তর ইত্যাদিও অনেক পাইয়াছি। কবি বংশীদাসের ভজনরত্নাবলী প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তকও পাইয়াছি।

৬। পদরত্নাবলীতে কানাই খুঁটিয়ার একটী গান আছে, রায় মহাশয় ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি, ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর উৎকলদেশীয় একজন ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে,—

"জয় জয় কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচার্য্য।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে,—

"এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হইলা॥
* * * *
* * * *
কানাই খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥
* * * *
* * * *
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলায় ঘরে যত ছিল ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ হইল।
পিতামাতা জ্ঞানে দোঁহে নমস্কার কৈল॥

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, কানাই খুঁটিয়া তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে একজন পরম ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য—গর্ব্বের সামগ্রী। অনুসন্ধান করিলে হয় ত এই ভক্ত কবির বিস্তৃত জীবনী এবং আরও পদাবলী আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা এ দিকে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পদরত্নাবলীতে অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণের পদের মধ্যে "যে দেশে আছিল বাঁশী সে দেশে মানুষ নাই" (৬০৩ সংখ্যক) এই যে পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে, চণ্ডীদাসের "কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী" (নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদ) এই পদটীর দুইটী চরণের সঙ্গে ইহার দুইটী চরণের অবিকল মিল আছে, ভাবেরও সামঞ্জস্য আছে। তথাপি পদরত্নাবলীর—"মন চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে" এই গানটীর ধারা দেখিয়া "যে দেশে আছিল বাঁশী" এই গানটীও আমাদের কানাই খুঁটিয়ার বলিয়া মনে হইয়াছে। মহাপ্রভুর সময় পুরীধামে চণ্ডীদাসের গানের বিশেষরূপ আলোচনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে, কানাইএর গানের মধ্যে চণ্ডীদাসের সুর বা গানের অবিকল দুই একটী চরণও পাওয়া যাইবে। "যে দেশে আছিল বাঁশী" গানটীর ভণিতা এইরূপ,—

বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী জীবনে কি আশা।
কানের ভিতর কানাইএর বাঁশী পাতিয়াছে বাসা॥

ভণিতার এই "কানাই" শব্দটীকে আমরা স্বার্থসূচক শ্লিষ্ট শব্দ বলিয়া মনে করি। পদরত্নাবলীর

এই দুইটী গান মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই দুইটী গানের বিষয়বস্তু ও রচনার ধারা প্রায় অভিন্ন।

উদ্ধব, শিবরাম, রাধামোহন, মাধব এবং সুরদাসের অনেকগুলি গান আমরা পাইয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই পদকর্ত্তা মাধবেরই "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল আজিও গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। দ্বিজ পরশুরামেরও একখানি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল আছে, এ গ্রন্থখানিও প্রকাণ্ড, এবং ইহাও গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। "মাধবী" ভণিতাযুক্ত "রসপুষ্টি মনোশিক্ষা" নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। মাধবীর পদও আছে।

৭। পদরত্নাবলীতে নটবর দাসের একটীমাত্র গান উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রায় মহাশয় কানাই খুঁটিয়ার মত ইহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিযাছেন। পদকল্পতরুতেও নটবর দাসের একটী পদ আছে।

আমাদের মনে হয়, নটবর দাসের বহু পদ আছে। আমরা নিম্নে যে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ প্রধান প্রধান ভক্তগণের প্রত্যেকেরই বন্দনা-গান রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ইহাঁর পাণ্ডবগীতার অনুবাদ পাইয়াছি। নিম্নে একটী পদ ও অনুবাদের একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

> তুমি মোর সখাবর সকল আনন্দকর সখাতে পরম প্রেষ্ঠা মোর।
> তোর গুণ গান করি রাধাভাবে ভাব ভারি সুবল বলিয়া নাম তোর॥
> আরে মোর গৌরীদাস পণ্ডিত।
> তুমি মোর প্রাণধন তোমাতে মোর সদা মন তুমি মোর গোপীতে মণ্ডিত॥
> অম্বিকাতে বাস হবে আমার সনে থাকিবে বিগ্রহেতে দুই ভাই স্থিতি।
> কহিতে কহিতে প্রভু স্থির নহে মন কভু আমার আমার করে নিতি॥
> কহে দাস নটবরে বহু সাধ মনে করে আমারে করহ তুমি সঙ্গী।
> রূপের সঙ্গিনী কর এই নিবেদন ধর কর মোরে চরণেতে রঙ্গী॥

পাণ্ডবগীতার অনুবাদ,—

> শল্য কহে শুন সবে কৃষ্ণরূপগুণ।
> কহিব আনন্দ মনে সভে মিলি শুন॥
> জয় জয় কৃষ্ণ গুণমণি।
> রূপগুণ কি কহিব কিবা আমি জানি॥
> জিনিয়া অতসীপুষ্প রূপ মনোহর।
> শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু পীত পট্টধর॥
> দাস নটবরে নতি করয়ে গোবিন্দে।
> ভয় মাত্র নাশ হয়ে কহিনু সানন্দে॥

৮। পদরত্নাবলীতে নূতন প্রকাশিত পদকর্ত্তা বলিয়া রায় মহাশয় যে কয়জনের নাম দিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বকথিত ১৭৭১ শকে প্রকাশিত "পদকল্পলতিকা" গ্রন্থখানিতে তাঁহাদের মধ্যে কাশীদাস, বীরবাহু, রাজচন্দ্র ও ভাগবতানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। ঐ ঐ পদকর্ত্তার পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত পদ কয়েকটীও অবিকল তাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে। কেবল ভাগবতানন্দের পদের দুইটী চরণ পদকল্পলতিকায় অতিরিক্ত আছে,—(১ম দুই চরণের পর),—

"জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধাকান্ত।
জাগহে রসিকবর কিশোরীপ্রাণনাথ॥

১৩৩১ সালের ৬—১২ সংখ্যক "বীরভূমি" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ভাগবতানন্দের দুইটী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। আর কাশীদাসের পদেও একটু গোলযোগ আছে। পদ-রত্নাবলীতে যেখানে আছে,—

বিলাসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ সঙ্গে নব নব রঙ্গিনী।

পদকল্পলতিকায় সেখানে দেখিতে পাই,—

"নাচে সুনাগর রাইকরে কর অধরে বেণুবর শোহিনী।

পদরত্নাবলীতে ইহার পরে যে দুইটী চরণ আছে, পদকল্পলতিকায় তাহা নাই। বাকী সমস্ত-টুকু একরূপ।

৯। পদরত্নাবলীতে "কুবের আনন্দ" পদকর্ত্তার একটী পদ আছে, পদটী গৌরাঙ্গবিষয়ক। আমরা দাস কুবের নামক একজনের ভণিতাযুক্ত একটী গৌরাঙ্গবিষয়ক বাউলের গান পাইয়াছি। দাস উপাধি বৈষ্ণবের সার্ব্বভৌমিক, সুতরাং কুবের আনন্দ ও দাস কুবের এক জনও হইতে পারেন। এমনও হইতে পারে যে, ছন্দের অনুরোধে 'আনন্দ' এখানে অন্তর্হিত হইয়াছে। এ কালেও কবিতার মিল খুঁজিতে খুঁজিতে অনেকেরই আনন্দ লোপ পায়, ইহা প্রায় বহুজনবিদিত। আনন্দের পরিবর্ত্তে কুবেরের পূর্ব্বে দীনতাসূচক দাস আসিয়া স্থান লইয়াছে, ইহাও অস্বাভাবিক না হইতে পারে। পদাবলীর সঙ্গে বেমানান্ হইলেও গানটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

যদি দেখতে পাই গউরময় সকলি।
গউর আমার বসন ভূষণ গউর নয়নপুতলী॥
গউর আমার নয়ানের তারা'
গউর-চান্দে গগন-চান্দে চান্দে চান্দ তারা'
মনহরা তার রূপ দেখে তুলি;
গউর আমার জপের মালা গউর গলার মাদুলী।
নয়নের অঞ্জন গউর'
গউর নলক উল্কি তিলক চন্দ্রহার গউর'

নাক্‌ছবি গউর চাঁপকলি ;
গউর আমার সোনার সিঁতি মুক্তামতি ঝলমলি ॥
গউর ঝুমক ঢেরী ছন্দ
গউর আমার খাড়ু বাজুবন্দ
গউর টিকলী গলার হাঁসুলী ;
গউর ঝটকা গজরা কোমড়বেড়া বরপাটা গো বিলকুলি।
গউর নথ, সাতলহর মালা,
চুলবান্ধা দড়ি গউর পঁইছে পউলা,
দু হাতের চুড়ি কাঁচুলী (আমার গউর)
দাস কুবের বলে নিদেন কালে পাই যেন চরণধূলি ॥

১০। তরুণীরমণ ও দীনবন্ধুরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।

১১। পদরত্নাবলীতে "অজ্ঞাত পদকর্ত্তাগণে"র রচিত কতকগুলি পদ আছে। এগুলির মধ্যে "সে বন কতই দুর," "ওরে বাঁশী কেমন কর্‌যারে," "বৈল নিঠুরের আগে," "কুশলের কি কাজ ওহে নাথ," "সে বেশ তোমার কৈ কৈ হে," "ব্রজে চলহে ব্রজেশ্বর," "ওহে নাথ সেই তো আইলে" প্রভৃতি পদগুলি "তুক্কো" বা "তুক" বা "পল্লব" গান। এগুলি একজনের রচিত নহে, কোন সুরসিক কবিত্বপ্রতিভাবান্ কীর্ত্তনীয়া হয় ত গান গাহিতে গাহিতে ভাবের মুখে অনুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক দুইটী "আখর" দিলেন, দলের লোক সেটী মনে করিয়া রাখিল বা তিনিই আসর হইতে বাসায় আসিয়া তাহা লিখিয়া রাখিলেন। এইরূপে হয় তিনিই, নয় ত তাঁহার পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক অপর একজন কীর্ত্তনীয়া সেই আখর দুটী শিখিয়া গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে আবার আর দুটী আখর যোগ করিয়া দিলেন, এইরূপেই তুক্কো গানের সৃষ্টি হয়। বিপ্র পরশুরাম বা দ্বিজ মাধব-রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কালীচরণ দাস প্রভৃতি নানা কবির রচিত দানখণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই একটী ধুয়া-গান কীর্ত্তন-গানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই সমস্ত গানে প্রায় ভণিতা থাকে না। এই ধরণের ভাঙ্গা গানগুলিও অনেক স্থলে তুক্কোয় পরিণত হইয়াছে, এবং যে সম্পূর্ণ গানগুলি কিম্বা শ্রুতিমধুর পয়ার বা ত্রিপদীর যে খানিকটা অংশ কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ সব মঙ্গলগ্রন্থ হইতে গানের সুবিধার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণ তাহাই ভণিতাহীন পদ বলিয়া আপন আপন সংকলিত গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছেন ; সেগুলি এখন অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদ বলিয়া চলিতেছে। প্রাচীন ঝুমুর গান হইতে তুক্কোর সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। পরমানন্দ অধিকারীর তুক্কো খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পাঁচালীর প্রসিদ্ধ কবি দাসু রায়ের— "দেবতা আর অসুরে
জামাই আর শ্বশুরে"
দোঁহাগুলি তুক্কোরই পরিণতি। কীর্ত্তন গানে "কথা", "দোহা", "আখর", "তুক", "ছুট" প্রভৃতি

কতকগুলি সংকেত প্রচলিত আছে, বারান্তরে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার ইচ্ছা রহিল। যদুনাথ দাসের গানের মধ্যে আমরা প্রসঙ্গত তুক্কোর নমুনা দিয়াছি।

১২। ইতিপূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহাশয় কিছু কম-বেশী প্রায় পৌনে দুই শত পদকর্ত্তার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পদরত্নাবলীতে আরও ২৮ জনের সন্ধান দিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে যথেষ্ট নহে,—যাঁহারাই প্রাচীন পুঁথির খবর রাখেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। আমরা যে অতি সামান্য লোক—আমরাই আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে পুরাণ পুথি সংগ্রহ করিতে গিয়া ডাঃ সেন ও রায় মহাশয়ের সংগ্রহের পরে আরও বত্রিশ জন নূতন পদকর্ত্তার নাম ও গান সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে ইহাঁদের নাম প্রকাশ করিলাম। পদ এবং পরিচয় যদি পারি, পরে প্রকাশ করিব।

পদকর্ত্তাগণের নাম

১। অকিঞ্চন দাস, ২। উদয়াদিত্য, ৩। কান্ত দাস, ৪। কৃষ্ণবিহারী, ৫। গঙ্গারাম, ৬। গোকুলানন্দ ঠাকুর, ৭। গোপীচরণ দাস, ৮। জগদানন্দ ঠাকুর, ৯। জয়নারায়ণ, ১০। দামোদর, ১১। দেবানন্দ, ১২। নসীরাম, ১৩। নয়নানন্দ ঠাকুর, ১৪। নীলকণ্ঠ, ১৫। ব্রজনাথ, ১৬। ভগীরথ, ১৭। ভবানীদাস, ১৮। মহাদেব, ১৯। মাণিকচাঁদ ঠাকুর, ২০। মুকুন্দ, ২১। যাদবিন্দ, ২২। যুগল, ২৩। রতন, ২৪। রামনারায়ণ, ২৫। রোহিণীনন্দন, ২৬। ললিতা দাস, ২৭। লালু নন্দলাল, ২৮। শোভারাম, ২৯। স্বর্ণলালী, (মহিলা কবি), ৩০। সেবাচান্দ, ৩১। হরিদাস, ৩২। হৃদয়রাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা

বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে এখনও আমরা অনেকেই একটি নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মান্দোলনের কথাই মনে করিয়া লই। বুদ্ধদেবের নামের দ্বারা পরিচিত হওয়ায় বহুশতাব্দব্যাপী ধর্ম্মধারাটির শাখাগুলির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে, নানা আচার্য্যের নব নব মত ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে প্রাচীন বুদ্ধমত কত যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা এখন আর লক্ষ্য না করিলে চলে না। আধুনিক পণ্ডিতদিগের এশিয়াব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু ঔদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য, এই দুইটি বিভাগে ফেলিতে পারিলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাপারটিকে বুঝিতে পারা যায় না। ইহাদের উভয়েরই মধ্যে আবার পরম তত্ত্ব ও অবান্তর বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় অসংখ্য উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই দর্শন ও শিল্পকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করিয়াই স্থগিত হইয়া যায় নাই—তাহার প্রভাব নূতন দর্শন ও শিল্পের জন্ম দ্বারা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমি বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য, বাঙালী বুদ্ধদেবকে কি চোখে দেখিয়াছে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার নামে পরিচিত ধর্ম্মসমাজগুলিকে সাধারণ বাঙালী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা। আমরা দেখিতে পাই, সকল সময়ে বাঙালী বুদ্ধদেবের মতকে অনুকূল ভাবে গ্রহণ করে নাই। একদিকে যেমন খাঁটি বৌদ্ধপ্রভাব বেশ প্রবল ছিল, অন্য দিকে আবার বিপক্ষতাও চলিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজে বুদ্ধদেব নিজে অবতাররূপে গৃহীত হইলেও তাঁহার মতকে বেদবিরোধী বলিয়া "পাষণ্ডমত" বলিতেও বাঙালী বিরত হয় নাই।

মোটামুটি প্রাচ্যভারতের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক কিছু বেশী ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধদেব নিজে মগধে সম্বোধিলাভ করেন। রাজগৃহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। তাঁহার দুইজন প্রধান শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন মগধের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম যে, এ দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে। কোন কোন প্রাচীন পালিসূত্র রাজগৃহেই রচিত হয় বলিয়া জানা যায়; যথা—রত্নমেঘসূত্র।

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক প্রিয়দর্শী নাম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের বহু স্থানে তাঁহার নিজের রাজ্যমধ্যে পর্ব্বতগাত্রে বা স্তম্ভগাত্রে বহু ধর্ম্মলিপি লেখাইয়াছিলেন। এরূপ লিপি লেখান প্রাচীন ভারতে বেশ চলিত ছিল। এ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা দেশের সীমার মধ্যে তাঁহার কোনই লিপি পাওয়া যায় নাই। সুদূর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশগুলিতে লিপি স্থাপিত করিয়া শুধু পূর্ব্ব-

দিকৃটি বাদ দিবার কারণ কি? তিনি "বুধসি ধংমসি সংঘসি" (ভাবক্ষ লিপি) তাঁহার "গৌরব ও প্রসাদের" কথা জানাইয়া বলিয়াছেন যে, "এ কেঞ্চি ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাষিতে ব্বা," সুতরাং তাঁহার সময়ে যদি বাঙ্‌লায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, তবে ত্রিরত্নের গৌরব ও বুদ্ধদেবের সুভাষিত বাঙালীর নিকটও মর্য্যাদা লাভ করিত, সন্দেহ নাই।

অশোকের সময়ে ও তাঁহার কিছু পরে প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধগণ বাঙ্‌লা দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে বড় একটা জানা যায় না। একটি কথা লক্ষ্য করিবার মত। বৌদ্ধদের প্রাচীন ১৬ জন স্থবিরের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন দেখা যায়। একজনের নাম ছিল কালিক, ইঁহার বাড়ী তমলুকে। ইনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইঁহার বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়,—Kalika belongs to Tamralipti, wears a golden ear-ring and sits surrounded by a circle of eleven hundred *arhats* (Mem. of A. S. B.—vol. I, no. 1, p. 2). আর একজনের নাম বনবাসী, ইনি রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহানিবাসী ছিলেন। ইঁহার বর্ণনা এইরূপ করা হইয়াছে, —Vanavasi—belongs to Saptaparni Guha, has two hands, one holding a fly-whisk of yak's tail and the other with a painted index finger, and sits surrounded by a circle of one thousand and four hundred *arhats* (Ibid., p. 2.) ইঁহারা প্রাচীন স্থবিরপন্থী ছিলেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। ইঁহাদের প্রভাব বোধ হয় কম ছিল না। কারণ, একজনের ১১ শত ও অন্য জনের ১৪ শত অর্হৎ ছিল, সুতরাং এই সংখ্যার উপযোগী শ্রাবক নিতান্ত কম থাকিবার কথা নয়। এই স্থবিরদের প্রভাব বাঙ্‌লা দেশে কতটা ও কতদিন ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তবে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেও আমরা সমতটে প্রাচীন স্থবিরপন্থীদিগকে দেখিতে পাই।

গুপ্ত-সম্রাট্‌দিগের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় বলা যাইতে পারে। সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প প্রভৃতিতে এক যুগান্তর আসিয়া পড়ে। পরমভাগবত গুপ্তসম্রাটেরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন না, রাজসাহায্য না পাইলেও বৌদ্ধ প্রভাব, বিশেষতঃ বৌদ্ধশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাঙ্‌লাদেশে গুপ্তসম্রাট্‌দিগের যে সব অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু প্রাচ্যভারতের শিল্প-চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মই বেশী সাহায্য করিয়াছিল। গুপ্তদিগের আমলে বাঙ্‌লা দেশের লোকেরা বৌদ্ধশিল্পের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করিত, তাহার নিদর্শন ভাগলপুরের নিকট সুলতানগঞ্জের তাম্রনির্ম্মিত দণ্ডায়মান বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ও দক্ষিণবঙ্গের শিববাড়ীতে প্রাপ্ত উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তিতেই শিল্পীর কলাকৌশলের সঙ্গে বুদ্ধের অন্তর্ভাবের চমৎকার মিলন ঘটিয়াছে।

বুদ্ধ সম্বন্ধে যতই প্রকৃত কথা লোকের অজ্ঞাত থাকিতে লাগিল, ততই তাঁহার নাম ও কাজের সঙ্গে নানা মায়া ও অলৌকিকতা জড়াইতে লাগিল। চম্পায় রচিত "অবদানকল্পলতায়"

এরূপ উক্তি আছে। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা"য় সুমাগধা অবদান নামে একটি কাহিনী আছে। ইহাতে দেখা যায়, প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পূর্ব্বে জৈন প্রভাব ছিল, পরে বুদ্ধের অনুশাসন প্রচারিত হয়। এই কিংবদন্তী কত দিনের প্রাচীন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে পৌণ্ড্রদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কথা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন ধরণের। সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ "দিব্যাবদান" হইতে আমরা জানিতে পারি, অশোকের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আজীবিক ও জৈনদিগের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্ত তাঁহার আকাশপথে চলাচলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোঝা যায়, তখন লোকে বুদ্ধদেবের প্রকৃত মহত্ত্বের কথা ভুলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বাহ্য বিভূতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে বহু চীনা ভ্রমণকারী এ দেশে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদের বিবরণ হইতে তখনকার মতামত জানা যায়। তখন কান্যকুব্জের প্রচলিত মতকে আদর্শ ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম আর আগেকার মত প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে চলিতে পারে নাই—তাহাকে দেব-বাদীদিগের সঙ্গে আপোষ করিতে হইয়াছিল। তাই কান্যকুব্জের রাজার উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও সূর্য্য সমানভাবে সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধমত যেরূপ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও সেইরূপ প্রভাব দেখা যায়। ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বরং বড় বড় রাজধানী-গুলিতে বৌদ্ধমন্দির অপেক্ষা দেবমন্দিরই বেশী ছিল বলিয়া জানিতে পারি। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির; সমতটে ৩০।৩২টি সঙ্ঘারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির; তাম্রলিপ্তিতে ১০টি সঙ্ঘরাম, কিন্তু বহু দেবমন্দির, আর কর্ণসুবর্ণে ১০টি সঙ্ঘারাম, কিন্তু ৫০টি দেবমন্দির উক্ত পরিব্রাজক নিজেই দেখিয়া গিয়াছিলেন।

একটি বিষয় আমরা বড় একটা লক্ষ্যই করি না যে, বুদ্ধদেবের বহু পরের যুগেও চারিদিকে বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যে দেবদত্তের সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষ করিয়া মনে হয়। ইহারা গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন বুদ্ধের পূজা করিত; কিন্তু শাক্যমুনি-বুদ্ধের বিরোধী ছিল। সেই জন্ত "বৌদ্ধ"সমাজে ইহারা ধিকৃত হইয়াছে। ইহারা এই বৌদ্ধবিপক্ষতা বহুদিন বজায় রাখিয়াছিল। ফা-হিয়েনের সময়ে ৪০৫ খৃঃ অব্দে শ্রাবস্তীতে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল (Leggeএর অনুবাদ, ২২শ অধ্যায়)। তখন বাঙ্‌লা দেশে ইহারা ছিল কি না, জানা যায় না। কিন্তু খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণে ইহাদের তিনটি মঠ ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ দেখিয়া গিয়াছিলেন (Beal's Records, ii, p. 201; Beal's Life, p. 131; Watters—On Yuan Chwang, II, p. 191)। সুতরাং কোন কোন অঞ্চলের বাঙালী বহুদিন পরেও বুদ্ধের মতকে গ্রহণ করে নাই দেখিতে পাইতেছি।

কর্ণসুবর্ণে যে সুধু বৌদ্ধবিরোধী সম্প্রদায় আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহা নহে, এখানকার রাজা শশাঙ্কও নাকি দারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাকে বৌদ্ধদের গ্রন্থে খুবই নিন্দিত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধরাই তাঁহার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তিনি নাকি বৌদ্ধ পাইলেই মারিয়া ফেলিবার জন্য ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। যথা,—

আ সেতোরা তুষারাদ্রেবৌ দ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
যো ন হন্তি স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যশিষন্নৃপঃ॥

Systems of Buddhistic Thought—Yamakami, Sogen p. 16.

আর তিনি নাকি বৌদ্ধদিগের পরমপবিত্র বোধিদ্রুমটিকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আরও ইউয়াঙ্-চোয়াঙের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন হীনযানের কোন কোন শাখা তাঁহার সময়ে বাঙলা দেশের কোন কোন জায়গায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—যেমন সম্মিতীয় শাখা। সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ই আত্মবাদ পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সম্মিতীয় সম্প্রদায় পুদ্গল-বাদ* স্বীকার করিতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের পূজার কথা আমরা জানিতে পারি। চীনা পরিব্রাজক ই-চিং সমতটের যে রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। বোধ হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন হীনযান ত্যাগ করিয়া বাঙালীরা ক্রমে মহাযান মতকে অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউয়াঙ্-চোয়াঙ্ সমতটে প্রাচীন স্থবিরমতাবলম্বী শ্রমণদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যেই ই-চিং আসিয়া সমতটে মহাযানের প্রভাব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছিল বুঝিতে হইবে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিহার নালন্দায় যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি বাঙলার সমতটের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত সে কালে নাকি ছিল না। আচার্য্য শীলভদ্র শুধু যে বৌদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বহু দিক্‌ও দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ-প্রধানেরা যে হিন্দুর শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের নানা শাখার মধ্যে খুব প্রীতিকর সম্বন্ধ যে ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন সম্প্রদায় হইতে যখন নূতন শাখার উদ্ভব হইত, তখনই পরস্পর অনৈক্য ও বিদ্বেষভাব দেখা যাইত। নূতন যুগের নূতন চিন্তার খাতিরে মহাযানীরা প্রাচীন হীনযান হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল—তাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছিল। কালে মহাযানের একটি শাখা সহজযান নাম ধারণ করিয়া প্রাচীন সকল মতকেই উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল।

---

* The view approaching the doctrine of a permanent Soul is pudgalavāda.—Central Conception of Buddhism by Stcherbatsky, p. 70.

এককালে তাহাদের প্রভাব বাঙ্‌লা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া এখানে তাহাদের কথা ও মতামত একটু আলোচনা করিলে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা ক্রমে কোন্ দিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

সহজপন্থীরা এতদূর অবধি গিয়াছে যে, তাহাদের বলিতে বাধে নাই যে, পরমতত্ত্ব স্বয়ং বুদ্ধেরও অগোচর রহিয়াছে, আর এ বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ইতর লোকের তফাৎ নাই।

বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ—(সহজবজ্রের দোহাকোষের অদ্বয়বজ্রের টীকা)। বুদ্ধদেবের নিজেরই যখন এই অবস্থা, তখন বুদ্ধপন্থীরা যে ইহাদের হাতে সহজে অব্যাহতি পাইবে না, তাহা ত বোঝাই যায়। শ্রীহেবজ্রে পাওয়া যায়,—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥ (বৌদ্ধগান ও দোহা—পৃঃ ৪)

সহজযানীরা সুপ্রাচীন শ্রমণপন্থীদের ও শ্রাবকযানের নিন্দা করিতে ত্রুটি করে নাই।

যেন্দ্রঃ দশশিষ্যঃ যদা ভিক্ষুঃ কোটিশিষ্যা যদা স্থবিরো যো দশবর্ষোপসম্পন্নঃ। তে সর্ব্বে কাষায়ধরবস্ত্ররূপমাত্রপ্রব্রজ্যাং গৃহ্নন্তি। তেন দেশনভিক্ষণশীলক্ষমাঃ চরন্তি। ন তথতত্ত্বমাজানন্তি। শঠকপটরূপেণ সত্ত্বান্ বিহেঠয়ন্তি। যদুক্তং ভগবতা পশ্চিমে কালে পশ্চিমে সময়ে ময়ি পরিনির্বৃতে পঞ্চকষায়কালে চ। যে ভিক্ষবো মম শাসনে ভবিষ্যন্তি তে সর্ব্বে শঠকপটরতা ভবিষ্যন্তি তথা গৃহারম্ভে রতি কৃষিবাণিজ্যরতাঃ সর্ব্বপাপকর্ম্মাণি করিষ্যন্তি। শাসনবিড়ম্বকাঃ যে পূর্ব্বে মারকায়িকাঃ তে সর্ব্বে শ্রমণরূপেণাবতরিষ্যন্তি। তত্র মধ্যে সত্ত্বস্থবিরাস্তে সাঙ্ঘিকোপভোগং হরিষ্যন্তি ইত্যাদি বিস্তরঃ।

ন তেষাং বোধিস্তৎকথং। যে শ্রাবকযানমাশ্রিতাস্তেষামুক্তলক্ষণেন ভঙ্গঃ। ভঙ্গাৎ পুনর্নরকং যান্তি। অথ শিক্ষারক্ষণমাত্রেণ বিনয়োক্তলক্ষণায়াঃ স্বর্গোপভোগমাত্রং ভবতি। ন পুনর্বোধিরুত্তমা। কুতঃ যতঃ স্থবিরার্য্যানন্দঃ পরিনির্বৃতস্তদা তেন ন কস্যচিৎ সমর্পিতঃ শ্রাবকে বোধিরুপদেশঃ স্যাৎ।—(বৌ. গা. দো. —পৃঃ ৮৮)

সহজবাদীদের কাছে ঐতিহাসিক বুদ্ধের কোন মূল্য ছিল না। তাহারা আবার মহাযানীদের মত বুদ্ধকে অলৌকিক ও অবতার বলিয়াও স্বীকার করিত না। মহাযানীদের শূন্যবাদ সহজযানে দেহবাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। মানুষের মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক বুদ্ধের আর কোন দরকার নাই, ইহাদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিলে প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছাড়া এই বৌদ্ধধর্ম্ম যে কিরূপ, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আগমশাস্ত্রে আছে,—

দেশনীয়প্রযোগেন বুদ্ধোঽয়মকল্পিতঃ।
পরমার্থচিত্তযোগেন ন বুদ্ধো নাপি অদ্বয়ঃ॥ (বৌ-গা-দো, পৃঃ ৫৭)

যেমন পরবর্ত্তী কালে কবীর, দশরথপুত্র মানবদেহধারী রামকে স্বীকার না করিয়া,

আত্মারামকেই পরমতত্ত্ব হিসাবে মানিয়াছেন, সেইরূপ ইহারাও বাহিরের বুদ্ধকে না মানিয়া নিজের দেহের মধ্যস্থিত বুদ্ধের কল্পনা করিয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই একটি প্রবল mystic চিন্তা ও সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই ॥—সরোজবজ্রের দোহাকোষ।

দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং...।—অদ্বয়বজ্রের টীকা।

(বৌ-গা-দো, পৃঃ ১০৭)

বীণাপাদ নামক চর্য্যাপদরচয়িতা যে "বুদ্ধ নাটকের" (বৌ-গা-দো, পৃঃ ৩০) কথা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা নির্ব্বাণ-ঘটিত একটি আধ্যাত্মিক গুহ্য ব্যাপার বুঝায়। তাহা ঐতিহাসিক বুদ্ধের নির্ব্বাণ নহে, শূন্যবাদসম্পর্কিত একটি মানসিক অবস্থা মাত্র।

এই সম্পর্কে সহজযানীরা বোধি লাভ করাকে দেহবাদের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা 'মহামুদ্রা' বলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বুদ্ধের নিজের সম্বোধির কোন সম্পর্ক নাই।

বোহি কি লাভই এণ বি দেহে।—কৃষ্ণাচার্য্যের দোহাকোষ।

মনুষ্যদেহং বিহায় দেহান্তরেণ বোধির্ন স্যাৎ।—ঐ টীকা মেখলা (বৌ-গা-দো, পৃঃ ১৩২)। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই সুর ধরিয়াই কি "দেহের মাঝে বৃন্দাবনের" কল্পনা করিয়াছেন?

বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ্যে লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ছদ্মবেশী বৌদ্ধমত চলিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মপূজাই বোধ হয় প্রধান। এই ধর্ম্মের উদ্দেশে রচিত সাহিত্যেও বুদ্ধকে বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে পাওয়া যায়,—

ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।—(পৃঃ ৫৭)

অনেকে মনে করেন, ইহা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু সিংহলে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা প্রাচীন হীনযানের অনুবর্ত্তী। সুতরাং হীনযানের কথা মহাযানপ্লাবিত বঙ্গে লোকের মনে ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐ বইয়ের কথাতেই আমরা পাই যে, এ লঙ্কা পূর্ব্ব দিকে ছিল, দক্ষিণ দিকে নয়—

পুব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার। (পৃঃ ৯৮)

সুতরাং এ জায়গা যে কোথায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে এরূপ কথার কোন মূল্য নাই।

কিন্তু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে আমরা দুইটি কথা পাই, যাহা দ্বারা বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্মকে ইঙ্গিতে বুঝান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়,—

ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে।

ইহা ঠিক জয়দেবের "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং" কথাগুলির সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়। অথচ শূন্যপুরাণের ধর্ম্মঠাকুরের নিজেরই আবার যজ্ঞ করা হইয়াছিল। শূন্যপুরাণের এই ধর্ম্মরাজ শব্দে বোধ হয় বুদ্ধদেবকেই বুঝাইতেছে।

আবার আমরা পাই,—

বেদশাস্ত্র শ্রীনিরঞ্জনর পাএ।—(পৃঃ ৯৩)

যজ্ঞ ও বেদের এই অবস্থা হইতে গৌতম বুদ্ধের কথাই মনে হয়। কারণ, বেদ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কাহারও মতে দেখা যায় না। এখানে অবশ্য জৈনদের কোন কথা আসিতেছে না।

শ্রীধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার বাহন উলূকের কথাও একটু বলা দরকার। ইনি আবার ধর্ম্মদেবতার বাহন মাত্র নহেন, প্রধান মন্ত্রীও। এই পরম অদ্ভুত জীবটিকে বাঙালীরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এখনও ঠিক করা যায় নাই। এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হইয়াছে, তাহা আলোচনার জন্য পণ্ডিতদিগের দরবারে পেশ করিলাম। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও শিল্পে বুদ্ধদেবের সঙ্গে নাগরাজদের খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেখা যায়। ইঁহারা অনেক সময়ে বুদ্ধের স্তব করিয়াছেন ও কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। নাগরাজদিগের মধ্যে একজনের নাম ছিল উলূক। "মহাব্যুৎপত্তি" গ্রন্থেও (Mem. A. S. B., vol, IV. no. 2, p. 166) উলূকের নাম আছে। উলূকের অর্থ করা হইয়াছে "the clear sighted." প্রাচীন বাঙ্‌লা গ্রন্থে কীর্ত্তিত উলূকেরও এই গুণটি দেখা যায়।

এখানে আর একটি বিষয়ের একটু আলোচনা হওয়া দরকার। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপূজার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমরা মনে করিতাম, সমস্তটা ধর্ম্মসাহিত্যে শুধু বুদ্ধেরই কথা আছে। আমার মনে হয়, এখন এ মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে। ধর্ম্মসাহিত্যকে আমরা দুইটি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম, রামাই পণ্ডিত প্রভৃতির উলূক বাহন ধর্ম্মের কথা, দ্বিতীয়, লাউসেন-সম্পর্কিত ধর্ম্মরাজের গীত। প্রথমটিতে যে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, তাহা উপরে আলোচনা করা গেল। কিন্তু "লাউসেনী দাড়া" একেবারে নিছক সূর্য্যপূজার কথা, উহাতে বৌদ্ধপ্রভাবের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। গ্রহভরণ, ধর্ম্মের ঘোড়া, পাদুকা পশ্চিমে সূর্য্যের উদয় দেওয়ান প্রভৃতি সূর্য্যের সঙ্গে বেমানান হয় না। এখনও বাঙ্‌লা দেশের বহু জায়গায় সূর্য্যকে 'ধর্ম্ম', 'গোসাঞি' প্রভৃতি বলিতে শোনা যায়। অন্য একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না। ধর্ম্মকে আমরা সাহিত্যে যেরূপভাবে পাইয়াছি, শিল্পে সেরূপভাবে পাই নাই। ধর্ম্মকে ধবলবর্ণ বলা হইয়াছে, তাঁহার যা কিছু সবই ধবল বলা হইয়াছে, তাঁহাকে নিরঞ্জন ও নিরাকার বলা হইয়াছে, অথচ ধর্ম্মের মূর্ত্তিগুলি যে কত অদ্ভুত রকমের, তার ঠিকানা নাই। কোথাও ধর্ম্ম কচ্ছপাকৃতি, কোথাও ঝিঁকের আকারের, কোথাও খালি মুণ্ডাকার। অথচ বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ শিল্পীর হাতে কি চমৎকার কারু হইতে শাদিত, তাহা আমাদের অজানা নাই। ধর্ম্মের ঐ সব রূপ দেখিয়া এক একবার সন্দেহ হয়, কোন লৌকিক জাতিগত চিহ্নকে (totemistic symbol) বৌদ্ধায়িত করা

হইয়াছে কিনা। কচ্ছপাকৃতিকে কেহ কেহ বৌদ্ধস্তূপের রূপক বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মের অন্যান্য রূপগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় সহজ নহে। যাহা হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙালী ধর্ম্মকে সাহিত্যে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, শিল্পে তাহা করে নাই।

ভারত ইতিহাসের মধ্যবর্ত্তী যুগে যখন প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল, তখন হিন্দুধর্ম্ম নূতন জীবনলাভের চেষ্টা করে। তাহার ফলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের দুইটি শাখা খুব প্রবল হইয়া উঠে,—(১) বৈষ্ণব ধর্ম্ম, (২) শৈব ধর্ম্ম। ইহারা দুইটিতেই বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও নিজ নিজ ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে টানিতে চেষ্টা করে। ইহার ফল বাঙ্‌লা দেশে কিরূপ হইয়াছিল, এখন তাহাই দেখা যাক্।

শিবঠাকুরের ইতিহাস অতি বিচিত্র। অনেকেই মনে করেন, তিনি ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রাচীন রুদ্রদেবতা ব্রাত্যদিগের পূজ্য ছিলেন, তিনি কি করিয়া মহাযোগী ও মহাদেব হইলেন, সে এক মহা রহস্যময় ব্যাপার। এখানেই শেষ নয়, অদ্বৈতবাদীদের "শিবোঽহং" মন্ত্রের প্রেরয়িতারূপে যে শিব উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার বিবর্ত্তন বড় সহজ ব্যাপার নয়।

বুদ্ধদেবের সাধনার কথা মনে হইলে যোগপন্থা ও জ্ঞানবাদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক এবং এ দুইটি বিষয়েই বুদ্ধের সঙ্গে শিবের অনেকটা মিল আছে।

১৩শ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র কবিভারতী বাঙ্‌লা দেশ ছাড়িয়া সিংহলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানকার রাজা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও তাঁহাকে "বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী" উপাধি দেন। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম "ভক্তি-শতকম্"। ইহার প্রথমকার শ্লোকটিতেই বুদ্ধ ও শিবের একত্ব একেবারে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে :—

জ্ঞানং যস্য সমস্তবস্তুবিষয়ং যস্যানবদ্যং বচঃ
যস্মিন্ রাগলবোঽপি নৈব ন পুনর্দ্বেষো ন মোহস্তথা।
যস্যা হেতুরনন্তসত্ত্বসুখদা নাম্না কৃপামাধুরী
বুদ্ধো বা গিরিশোঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্ম্মহে॥

এই ধারণা শুধু কবির নিজের একার, না তখনকার বাঙালীরও ইহাই মত, তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। কারণ, আমরা দেখি, প্রাচীন যুগের বাঙালী বৈশ্যসমাজে যে উচ্চ আদর্শের শিব 'মহাজ্ঞান' লাভের জন্য পূজিত হইতেন, তাঁহার জায়গায় মধ্যযুগে ভাঙ্গড় ও চাষ-আবাদী শিবের গানই বাঙ্‌লা দেশে খুব বেশী করিয়া চলিয়াছিল।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ অথবা রূপপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাযানীদের বহু দেবী শিবের নিজের শক্তিতে বা শৈবমণ্ডলে আসিয়া পড়িলেন। তারা, হারীতী, বাগীশ্বরী প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে শিবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কোথাও

চণ্ডী, কোথাও মনসা, কোথাও শীতলা, কোথাও সরস্বতী প্রভৃতিরূপে দেখা দিলেন। এই সম্পর্কে বাঙ্লা দেশে প্রচলিত তন্ত্রগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, উহাতে বুদ্ধদেবের কোন কথা আছে কি না। অক্ষোভ্য, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি মহাযানী দেবতার উল্লেখ তন্ত্রে পাওয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধের সম্বন্ধে তন্ত্রের ধারণাটি কি ছিল, তাহা আমাদের জানিতে আগ্রহ হইবারই কথা।

পালরাজদিগের সময়ে বাঙ্লাদেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্লা দেশ বাহির হইতে নানা প্রভাবের অধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন বাঙ্লার নিজস্ব শিল্প ও শাস্ত্র সুধু দেশে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু জায়গায় ছড়াইয়া গেল। পালরাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের নিকট অবনতমস্তকে থাকিতেন, এ কথা তাঁহাদের অনুশাসন হইতেই জানা যায়। তাঁহারা "পরমসৌগত" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, অথচ "নারায়ণ-মন্দির" ও "পাশুপত সমাজ" স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মারীচী, কেহ বাগীশ্বরী, কেহ অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন জানা যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহারা কি মনে করিতেন, জানিবার উপায় নাই। এই সময়ে "বুদ্ধভট্টারক-মুদ্দিশ্য" অনেক ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দান-ধ্যান করা হইত, কিন্তু তবু গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে দেশের সাধারণ লোকদের মন সচেতন ছিল কি না, জানা যায় না। মধ্যযুগের মহাযানীদের একটি মন্ত্র (formula) এই সময়কার অনেক মূর্ত্তিতে খোদিত দেখা যায়,—

যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদত্তেষাঞ্চ যো নিবোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥

কিন্তু যে হেতুবাদের গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ তখনকার বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্ম হইতে পাইবার উপায় নাই। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের পরিবর্ত্তে অসংখ্য দেব-দেবী ও পূজা-পার্ব্বণাদিতেই লোকেরা আসক্ত হইয়াছিল। এই যুগে বুদ্ধের মূর্ত্তি অপেক্ষা মহাযানের ও বজ্রযানের দেব-দেবীর মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। তবে এই বুদ্ধমূর্ত্তি-গুলির শিল্পসৌষ্ঠব প্রশংসার যোগ্য বটে। একটি বুদ্ধমূর্ত্তি বিক্রমপুরের এক স্থানে এখনও লোকে পূজা করিতেছে; কিন্তু তাহাকে বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া কেহ জানে না, তাই তার নাম দিয়াছে "চিন্তামণি ঠাকুর।"

পালরাজদিগের সময়ে বাঙ্লাদেশে সিদ্ধাচার্য্যদিগের প্রভাব খুব প্রবল ছিল। তাঁহাদের অনেক কথা ও গান মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া বাঙালী-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি যে সব সিদ্ধার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও অনেক সিদ্ধা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালী ছিল। এরূপ কয়েক জনের নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। পারীর "মুসে গীমে" নামে শিল্প-সংগ্রহের বৌদ্ধবিভাগে অনেকগুলি মহাসিদ্ধার চিত্র ও মূর্ত্তি সংগৃহীত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ডিঘিলি, তার বাড়ী ছিল দেবীকোটে; এই দেবীকোট উত্তরবঙ্গে ছিল। আর এক জন ছিল,

পুতলি। আর একজনের নাম নাগবোধি। মেকোপ নামে আর এক জন সিদ্ধার কথা পাওয়া যায়—ইহাদের সকলেই বঙ্গবাসী বলিয়া অভিহিত। আর এক জনের নাম ছিল কপালিক, ইহার বাড়ী ছিল রাজপুরী, ইহা বঙ্গদেশে কি না, এখনও ঠিক হয় নাই (Guide-Catalogue du Musée Guimet—Les Collections Bouddhiques—J. Hackin, Paris, 1923, pp. 98-108)। এই সব সিদ্ধাচার্য্য বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলেও, বুদ্ধদেবের বড় একটা ধার ধারিতেন না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই বাঙ্‌লাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শৈব ধর্ম্মের প্রসার হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দু রাজারাও এই দুই ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করায় বৌদ্ধধর্ম্ম আর মাথা তুলিয়া চলিতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে নাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজা হরিবর্ম্মদেব বৌদ্ধ ও জৈনদিগের "শর্ম্ম-সংমর্দ্দনকারী" বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্টের অনুসরণে প্রাচীন মীমাংসা-সূত্রের ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী রচনা করিয়া তাহার নাম দেন "তৌতাতিত-মত-তিলকম্।" ইহা তৌতাতিত বা কুমারিল ভট্টের তন্ত্র-বার্ত্তিকের একখানি প্রসিদ্ধ টীকা। যে কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ পাষণ্ডগণের মস্তক উদূখলে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার এরূপ উপযুক্ত অনুশিষ্যও যে সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহা মনে হয় না। কুমারিল ভট্টের আর একটি কথায়ও বঙ্গীয় শিষ্যদের নিশ্চয়ই মত ছিল। তিনি তাঁহার "তন্ত্রবার্ত্তিকে" (Benares Sanskrit Series, p. 171) লিখিয়াছেন,—বৌদ্ধশাস্ত্র 'অসাধুশব্দভূয়িষ্ঠ' বলিয়া উহার শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয় না; মাগধ অপভ্রংশ উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া, 'অসত্য শব্দ' ব্যবহার করায় উহার 'অর্থসত্যতা' আর কিরূপে হইতে পারে আর তার 'অনাদিতা'ই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? এরূপ চমৎকার যুক্তি নিশ্চয়ই বৌদ্ধবিরোধীদের রুচিকর হইয়াছিল।

পালরাজদিগের সময় হইতেই বাঙ্‌লা দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাঙ্‌লা দেশে প্রাপ্ত এই সময়কার বাসুদেবমূর্ত্তিগুলি বঙ্গীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাঙ্‌লার ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের গোড়ায় এই বাসুদেবীয় বা ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম্মকে দেখিতে পাই। পালরাজদের মন্ত্রী গুড়ব মিশ্র গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন। মদনপালদেবের রাজসভায় মহাভারত পাঠ হইত। সপ্তগ্রামে যে কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত কতকগুলি মূর্ত্তি ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তখনও বোধ হয়, বুদ্ধকে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়া বাঙালী স্বীকার করিয়া লয় নাই।

বাঙ্‌লার সেনরাজদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে রাজারা একই সঙ্গে পরমভাগবত ও পরমমাহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বাঙ্‌লায় এক নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেখা দিল, যাহার ফলে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাধা প্রবেশ

লাভ করিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর চিত্তকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, এই নব বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থান দেওয়া হইল—বাঙলাদেশেও জয়দেব এই কাজ করিলেন। বুদ্ধকে প্রাচীনতর হিন্দুরা নিন্দাই করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে "পাষণ্ড" ছাড়া আর কিছু বলিতেন না। এখন বৌদ্ধদের সঙ্গে সন্ধি হওয়ায় অন্ততঃ বুদ্ধদেবকে আর তাঁহারা অনাদর করিলেন না। বৈষ্ণবেরা মধ্যযুগের মহাযানীদের অসংখ্য দেবদেবীকে গ্রহণ না করিয়া, একেবারে স্বয়ং বুদ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। লোকের মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাই বুদ্ধদেব যে যজ্ঞনিন্দা ও পশুবধ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্যই তাঁহাকে আর নিন্দা করিতে পারিতেছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব বাঙালী কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দে"র পদে আছে,—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

বুদ্ধের কারুণ্যই জয়দেবকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিযাছিল; তাই তিনি "কারুণ্যমাতন্বতে" বলিয়া আর একবার বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতী বুদ্ধের বেদনিন্দার জবাব দিয়াছেন (ভক্তিশতকম্) :—

যত্র ছাগ-তুরঙ্গ-মারণবিধির্বেদোঽপি ত্বং নিন্দসি
প্রেম্ণা প্রাণভৃতামতঃ সকরুণস্ত্বত্তো মহাত্মাপরঃ।
এবং তে গুণসম্পদো ন বিষয়া বুদ্ধেরসুরাত্মনাং
তে মূঢ়া প্রলপন্তি হন্ত সুগতো মদ্বেদনিন্দত্যয়ম্॥

বিষ্ণুর অবতারদিগের মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র এই আছে যে, কোন দৈত্য বিনাশ বা সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্যই উঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধ সেরূপ কোন কাজের জন্য আসেন নাই। এ কথা হিন্দুরা ভুলিয়া যায় নাই। তাই বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে বুদ্ধের উল্লেখের মধ্যেই ঐ তফাৎটুকুর একটু আভাস হিন্দুকবির কাব্যে পাওয়া যায়। ১৪শ শতাব্দীর কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন।—কৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ২৩৫।

হিন্দুকবি বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানিয়াও আবার বলিতেছেন যে, তিনি নিজেই নিরঞ্জনের ধ্যান করিতেন। বুদ্ধের ধ্যানের সম্বন্ধে এ ধারণা করিবার অধিকার বাঙালী কবি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?

জয়দেবের বুদ্ধ-বন্দনার পর বাঙালীসমাজে ধর্ম্মপূজকেরা ও বৈষ্ণবেরা বুদ্ধকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙলার লৌকিক শাক্ত-সাহিত্যে প্রকারান্তরে বুদ্ধের নিন্দাই পাওয়া যায়, যদিও ঐ সকল গ্রন্থকার বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের

নামে প্রচলিত ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ১৩০) পাওয়া যায় যে, "কৃষ্ণের দশ অবতারে"র মধ্যে বুদ্ধও একজন ছিলেন, তাই "বৌদ্ধের (বুদ্ধের) পুষ্পং জয়।" বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (আদি, ২য় অধ্যায়) পাওয়া যায়,—

"বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম্ম করহ প্রকাশ।"

শাক্তেরা কিন্তু বুদ্ধকে এ ভাবে দেখেন নাই। মাধবাচার্য্যের "জাগরণে" (চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৩১১, পৃঃ ৭) আছে,—

বৌদ্ধ অবতারে প্রভু জগতমোহন।

কবিকঙ্কণও তাঁহার "চণ্ডী"তে (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬২) লিখিয়াছেন,—

"ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ।"

এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বুদ্ধদেব লীলাবশতঃ পাষণ্ডমত অবলম্বন করিয়া বেদবাদ-বিরোধীদিগকে মোহাবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে পরিশেষে বেদপন্থীদেরই জয় হইয়াছিল এবং বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল। এই কথাটি তলাইয়া দেখিলেই ব্রাহ্মণ্যপন্থীরা বুদ্ধকে কেন খাতির করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে বাঙালীর আর একটি ধারণা এই যে, পুরীর জগন্নাথ আসলে বুদ্ধদেবেরই মূর্ত্তি। এই ধারণার বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। হয় ত বৌদ্ধ ত্রিরত্নকেই হিন্দুরা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বানাইয়া লইয়াছে। কিন্তু কোন প্রাচীন পুরাণেই বোধ হয়, এই হিন্দু ত্রি-মূর্ত্তির একত্র পূজার ব্যবস্থা নাই।

রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মপূজাবিধানে" আমরা বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে যেখানে বুদ্ধের কথা আছে, সেখানেই জগন্নাথের উল্লেখ দেখিতে পাই;—

নবম মূর্ত্তিতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি
জলধির তীরে কৈলা বাস।
প্রশাদ কোরিয়া দান নরে দিলে সন্নিধান
সমনেরে করিলে নৈরাশ ॥—(পৃঃ ২০৬-৭)

আবার— দশ মুরুতে গোশাঞি বলালে জগর্নাথ।
নিমের পৃতিম গোশাঞি সুবর্ণের দুটি হাত ॥—(পৃঃ ২১৪)

আর এক জায়গায় স্পষ্টতঃই জগন্নাথকে বুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে,—

জলধির তীরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান্
হয্যা তুমি কৃপাবলোকন।
প্রশাদ করেতে দিয়্যা নরে শন্নিধান [illegible]
কৈলে তুমি নৈরাস সমন ॥—(পৃঃ ২০৮)

শুধু যে সাহিত্যেই এই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে; শিল্পেও ইহা স্থায়িত্ব লাভ

করিয়াছে। কাশিমবাজারের ব্যাসপুরে কেশবেশ্বর নামে এক শিবের মন্দির আছে। ইহা ১৮১১ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের গায়ে ইটের উপর নানা প্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্ত্তি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দশাবতারের যেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি থাকিবার কথা, ঠিক সেইখানে জগন্নাথের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই মন্দিরটি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং এ বিধানের মূলে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী কিছু থাকা সম্ভব নহে। বনবিষ্ণুপুরে প্রচলিত দশ অবতারের চিত্রযুক্ত গোলাকার খেলার তাসগুলিতে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার ঠিক আছে, কেবল বুদ্ধের স্থান জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে দেওয়া হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মধ্যযুগের বাঙালীরা বুদ্ধকে ভাল চোখে দেখিলেও বুদ্ধের দয়া ছাড়া আর কোন গুণের সন্ধান তাঁহারা পান নাই। বুদ্ধের আসল মত হেতুবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মকে তাঁহারা স্বস্তির সহিত সহ্য করিতে পারিতেন না। বুদ্ধের মহিমা কোন রকমে স্বীকার করিয়া লইয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সমসাময়িক বৌদ্ধদিগকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না। বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে মানিলেন বলিয়া বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধপ্রভাব কমিয়া গেল; তখনও যাহারা প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত বজায় রাখিয়াছিল, তাহারা বৈষ্ণবদের অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বহু জায়গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (আদি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে লেখা হইয়াছে,—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

ইহা দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুকে বড় এবং বোধ হয়, ধ্যানাবস্থাপন্ন বৌদ্ধদিগকে ছোট করিতে যাইয়া পরমসহিষ্ণু বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৈষ্ণবতাই দেখাইয়াছেন বটে! বুদ্ধের প্রশংসা করিয়া বৌদ্ধদের অনর্থক নিন্দা করা হইয়াছে! বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদিগকে "ব্যর্থ জন" বলিয়াছেন, এবং তাঁহারা যাহাদিগকে পাষণ্ড বা পাষণ্ডী বলিতেন, বৌদ্ধরাও সেই দলের মধ্যেই ছিল।

বৈষ্ণবদের এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। বৈষ্ণবেরা মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া মনে করিতেন (পদ্মপুরাণ, উত্তর, ৬২।৩১)। এই জন্য বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

বেদ না মানিঞা বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥—চৈ, চ, মধ্য, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই গ্রন্থেই (মধ্য, ৯ম পরি) দেখা যায়, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তখন এক জায়গায় তখনকার বৌদ্ধদের সাক্ষাৎ পান ও তাহাদের তর্কপ্রধান নবমতের খণ্ডন করেন,—

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ—অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিলা প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্থান সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধের হৈল লজ্জা-ভয় ॥

বিশ্বম্ভর দাসের "জগন্নাথ-মঙ্গল" গ্রন্থে মধ্যদেশের দুই ব্রাহ্মণ-সন্তানের গল্প আছে, তাহাদের একজন "বৌদ্ধ নাস্তিকের" সংস্পর্শে আসিয়া বিষ্ণুপূজা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই গল্প হইতে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহা একটু জানা যায়,—

বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে।
বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে ॥
* * * * *
বিষ্ণুপূজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত।—(পৃঃ ১৪৭)

বেদবাহ্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদিগকে একেবারে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ ও শবরদের সামিল করিয়া, মানবসমাজের কলঙ্কস্বরূপ বৌদ্ধদের কথা তাঁহারা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥—চৈ, চ, মধ্য, ১৯ম পরি।

একজন বাঙ্গালী কবি কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে

মথুরার বৌদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্যই কৃষ্ণের অবতার দরকার হইয়াছিল। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস। তাঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে" [সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ] বিষ্ণুর ২২টি অবতারের মধ্যে বিংশ অবতার কৃষ্ণ।

বিংশতি শ্রীমধুপুরে কৃষ্ণ অবতার।
বেদনিন্দাকারী বৌদ্ধ করিলে সংহার ॥—(পৃঃ ৩)

বৌদ্ধরা হেতুবাদী ছিল বলিয়া ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা তাহাদিগকে তন্ত্র দিতে রাজী হইতেন না। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" আছে,—

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন জাপয়েৎ ॥

এককালে বাঙ্‌লা দেশের বৈশ্যগণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার বেশী ছিল, এবং উহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, এইরূপ অনেকে মনে করেন। "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকেও" এ ধরণের কথাই পাওয়া যায়,—

......বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।

এই জন্যই কি বৌদ্ধবিদ্বেষী নিত্যানন্দ বণিক্‌দিগের উদ্ধারে চেষ্টিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়?—

বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।

এক সময়ে বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে হিন্দু-তান্ত্রিকতা খুব প্রবল হইয়াছিল জানা যায়। হিন্দু-তান্ত্রিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার কোন সম্পর্ক ছিল কি না এবং হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করা যাক্।

হিন্দু তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের বিদ্যাকে কুলবিদ্যা নামে অভিহিত করেন। এই 'কুল' শব্দের অর্থ বড় একটা পরিষ্কারভাবে কোথাও দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারিটি দেব দেবী ছাড়া হিন্দু তান্ত্রিকেরা বৌদ্ধদের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু বলেন নাই। অথচ 'কুলসেবা'র কথা তাঁহাদের গ্রন্থে খুবই আছে। সহজযানীদের একজন পাণ্ডা ছিলেন ডোম্বী হেরুকপাদ। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম 'সহজসিদ্ধি'। ইহা শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন। ইহাতে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহাতে হিন্দুতন্ত্রকে বৌদ্ধতন্ত্র-সম্পর্কিত মনে হইতে পারে। এই গ্রন্থে আছে,—

কুলসেবাৎ ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ব্বকামপ্রদা শুভা।

কুলগুলির সংখ্যা পাঁচ,—অক্ষোভ্য, বৈরোচন, অমিতাভ, রত্নসম্ভব ও অমোঘসিদ্ধি, এই পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ হইতেই কুলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে কুলেশ বলিয়া থাকে।

অক্ষোভ্য বজ্রমিত্যুক্তং অমিতাভঃ পদ্মমেব চ।
রত্নসম্ভবো ভাবরত্ন বৈরোচনস্ত আগতঃ।
অমোঘ কর্ম্মমিত্যুক্তং কুলান্যেতানি সংক্ষিপেৎ॥—("উত্তরা", জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)।

প্রাচীন হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া খুব শক্ত। এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালের সংগ্রহগ্রন্থ, মৌলিক রচনা নহে। এই পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। বহু চেষ্টায় "গায়ত্রীতন্ত্রে"র ৫ম পটলে দেখিতে পাই, উহা বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই,—

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৌদ্ধমতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু পল্লবং।

তবু এই গ্রন্থ বৌদ্ধদের নিন্দা করিতে একটু দ্বিধা বোধ করে নাই,—

১। বেদে বৌদ্ধে বিবাদোঽস্তি বেদোক্তং প্রতিপালয়েৎ।
বৌদ্ধোক্তং রাজশার্দ্দূল দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
২। চৌর্য্যো বৈ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মধ্যে বৌদ্ধ ইতি স্মৃতঃ।

বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, অনীশ্বরতা, শিখাধ্বংসন্যায় প্রভৃতি তান্ত্রিকেরা সহ্য করিতে পারেন নাই,—

১। বৌদ্ধাঃ শূন্যতাবাদিনঃ।—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, শ্লোক ১৭
২। বৌদ্ধো বদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরো নাস্তি নাস্তি বৈ।
অহমেবেশ্বরঃ সাক্ষাদিতি বৌদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ॥—গায়ত্রীতন্ত্র
৩। কুতঃ স্বর্গো কুতো ভোগো নষ্টঃ কো বা হতো নৃপ।
ত্যক্ত্বা দেহং যযৌ শক্তির্মরণং তেন কথ্যতে॥
ইতি বৌদ্ধস্য রাজর্ষে যথা বাক্যমলীকবৎ।
যথা বহ্নেঃ শিখাধ্বংসং সর্ব্বেষাং ধ্বংসমুচ্যতে।
ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ কা কথা পরজন্মনি।—গায়ত্রীতন্ত্র
৪। আত্মানন্দময়ো জীবঃ কলা শ্রীরস্তরাত্মনঃ।
সদা জীবেতি জীবেত্তি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
তৎ কথমাত্মনো ধ্বংসো বৌদ্ধবাক্যেন ভূপতে।
শিখাধ্বংসমিতি ন্যায়াদিতি বৌদ্ধস্য মূর্খতা॥—গায়ত্রীতন্ত্র

বৌদ্ধেরা দশ দণ্ডের মধ্যে ভোজন করিত বলিয়া ও তাহারা বলিদান নিষেধ করিত বলিয়া তান্ত্রিকেরা উহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন—

১। দশদণ্ডাভ্যন্তরে রাজন্ ভোজনং স্বর্গমুচ্যতে।
সংত্যজ্য আত্মতা ভোগে-নষ্টঃ কো বা হতো নৃপ॥
২। বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবাক্যতঃ।

এই প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে বুদ্ধকে

স্বীকার করিয়া লইয়া, বৌদ্ধদিগকে অস্বীকার করিবার একটা প্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের মধ্যে বরাবর দেখা গিয়াছে। এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এ দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মোগল-সম্রাট্ আক্‌বরের সভায় ভারতবর্ষের সকল ও ইউরোপের দুই একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক দেখা যাইত। তাঁহারা সম্রাটের ইবাদাৎ-খানায় বিচার বিতর্ক করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের কোন কথা পাওয়া যায় না। আবুল ফজল তাঁহার আইন্-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৌদ্ধদের কোন সন্ধান পান নাই এবং শুধু আরাকানে বৌদ্ধেরা বাস করিত। এ সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই বাঙ্‌লা দেশের লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সাধারণ বাঙালীর ধারণা বুঝিতে পারা যায়। অথচ সেই সময়েই প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিত ছিল। লামা তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। ১৬০৮ খৃঃ বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তারানাথের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত 'বুদ্ধপুরাণ' নামে এক গ্রন্থ লেখেন, উহাতে সেনবংশের কয়েকজন রাজার ইতিহাস ছিল। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু লেখা হইয়াছিল। গ্রন্থ না পাওয়ায় কোন খবর জানিবার উপায় নাই।

কতকগুলি অপ্রকাশিত বাঙ্‌লা পুথিতে এমন একটু একটু খবর আছে, যাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থ না পাওয়ায় মোট কথা যাহা জানা গিয়াছে, তাহা লইয়া বেশী আলোচনা সম্ভবপর নহে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুথিগুলিতে কি ছিল, তাহা জানিবার কৌতূহল তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। বাঙালী হিন্দু কবিরা যে বুদ্ধদেবকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণ রাধামাধব ঘোষের "বৃহৎসারাবলী" নামক বাঙ্‌লা ভাষার বৃহত্তম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি খাঁটি পৌরাণিক বৈষ্ণব অবতারের ন্যায় বুদ্ধদেবের লীলাও বর্ণিত আছে। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের বুদ্ধলীলা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, চূড়ামণিদাস নামক একজন লেখকের একখানা চৈতন্যচরিত গ্রন্থ আছে—তাহাতে নাকি চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও আনন্দিত হওয়ার কথা আছে। এই গ্রন্থ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আরও খবর জানা যাইতে পারে। ১৬৮৯ খৃঃ রচিত রামজীবন বিদ্যাভূষণের "সূর্য্যমঙ্গল" খানি অতি বিরাট্ গ্রন্থ। ইহাতে সূর্য্যোপাসক আচার্য্যগণের হস্তে বৌদ্ধ হাড়িদের নির্য্যাতন বর্ণিত হইয়াছে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দীনেশ সেন, পৃঃ ১৬৩)। ইহাও আমরা পাই নাই। কুচবিহারনিবাসী গোবিন্দ দাস নামে একজন লেখকের গ্রন্থে নাকি বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় (উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, ৩য় গৌরীপুর অধিবেশন, ১৩১৬, কার্য্যবিবরণ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৫)। এ সম্বন্ধেও আর খবর পাওয়া যায় নাই। মগদের দেশে লিখিত "বুদ্ধঙয়াং" বা বুদ্ধরঞ্জিকা নামে একখানা বাঙ্‌লা গ্রন্থ আছে, ইহা ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। ইহাতে বুদ্ধদেবের চট্টলভ্রমণের কাহিনী লিখিত আছে

("ভারতবর্ষ"—অগ্রহায়ণ, ১৩২৮)। বৌদ্ধগ্রন্থকার এ অদ্ভুত খবর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। এখানেও বুদ্ধদেব "বায়ুভরে রথে আরোহণ" করিয়া 'আর্কান' গিয়াছিলেন।

শ্রীরমেশ বসু

দীন চণ্ডীদাস

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

[বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকার দুই সংখ্যায় দীন চণ্ডীদাসের যে সকল পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই পুথিখানা খণ্ডিত, এবং স্থানে স্থানে অতিশয় অস্পষ্ট। তাহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠার পাঠ এই পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২২ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠার অনেক স্থানে কোন পাঠই উদ্ধৃত করিতে পারা যায় নাই। তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ নম্বরের পুথিতেও এই পালাটাই পাওয়া গিয়াছে। *তাহাতে উক্ত অস্পষ্ট স্থানগুলির যে পাঠ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই* প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত হইবে। ২৩৮৯ নম্বরের পুথির প্রথম পদটী ৪৮০ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; ইহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় ৪৮০ হইতে ৪৯৭ সংখ্যানির্দ্দিষ্ট ১৮টী পূর্ণ পদ এবং পরবর্ত্তী পদটীর মাত্র পাঁচ পঙ্‌ক্তি পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২৯৪ নম্বরের পুথিতে এই পদগুলি ১, ২ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইযাছে এবং তাহাতে উক্ত ১৮টী পদের পরেও প্রায় ৫০টী নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাও ধারাবাহিকরূপে এই স্থানে প্রকাশিত হইল।]

[২৩৮৯ নম্বরের পুথির ৪৯৮ সংখ্যক পদ (১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং ২৯৪ নম্বরের পুথির ১৯ সংখ্যক পদ।]

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
আর না জানয়ে কেহু।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন এ নহু নহু॥
পীরিতি শত গুণ শত শত করি
তার লাখ গুণ যেই।
তার এক কণা গোপীগণ পায়ে
আর না জানয়ে কোই॥
তার লাখ গুণ শত শত হয়ে
তবে সে যে জন রয়।

মণিফণিগণ যত ভক্তগণ
কণিকা পীরিতি হয়॥
পূর্ণ ষোল কলা জানয়ে মরম
সেই সে কিশোরী রাই।
এক শত গুণ তাহার মরম
আমি সে জানিয়ে নাই॥
তার এক কণা শত শত ভাগ
এ নন্দ যশোদা জানে।
কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু
আছয়ে কাহার স্থানে॥

চণ্ডীদাস বলে এ কথা শুনিতে
দেবের হইল সুখী।
দেবের বচন করিল রচন
ব্যাসমুনি ইহা লেখি॥ ১৯॥

গোবিন্দ বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি
কহে কিছু দেব ভগবান।
তোমার অপার লীলা যার গুণে পশু শিলা
তরু পুলকিত ইহা জান॥
তোমার পীরিতি বহুমূল।
এমন পীরিতি খনি কখন নাহিক শুনি
এবে সে জানিল এতদূর॥
এমন সম্পদ সুখ বিহি ভেল বৈমুখ
মনে ছিল রাখিব গোপনে।
তাহার কারণে মোরা করিল অনেক ধারা
এমন বলিয়া কেবা জানে॥
আপনে গোলোক হরি তাহা প্রীত পান করি
মো সভা হইনু বঞ্চিত।
প্রভু কহে বেরি বেরি শুন ত্রিলোচনধারী
সব দেবে হইবে বঞ্চিত॥
চল সভে মর্ত্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বসুদেব দৈবকী উদরে।
লয়া নন্দ যশোমতি গোকুলে রাখব তথি
ব্রজলীলা রচিব সুন্দরে॥
আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন।
লুইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে
রাই দরশন আশ হেন॥
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু।

অষ্ট রস অষ্ট গুণে ইহা লাগি আস্বাদনে
আর যত উপরস পিছু॥
প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইঁহার মাধুরি।
এই রস তত্ত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী
চণ্ডীদাস না জানে মাধুরি॥ ২০॥

ছের ছটাক বহিন্নিকট
রস রস বেদবান।
চন্দ চন্দক ভানু পুষ্কর
দ্বিতিক প্রধান আন॥
বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহির্মিক
উদণ্ড চারি ছয় লোভা।
কায় কামার্ত্তক রোহিণী নির্ল্লট
জটপট় সাত্তিক শোভা॥
মদয়ত প্রাণ তপতিরোহিতা গুণ
নয় নয় ছয় করি জান।
বসুমতি বসধাই এ সব জানত
নব নব করি ইহা মান॥
আট রস চৌসট তরতম নির্ল্লট
আট আট বসু বেদে।
গুণ গুণ প্রেম্বিলা গুণ গুণ কর
সাত সাত সট খেদে॥
বেদ বেদ ৩যু গুণ তহি আথর
যো ইহা জন সুজান।
রসে রসে মেলত লোয় গুসর
চণ্ডীদাস গণত সুঠান॥ ২১॥

এক সায়র তাহার উপর
অমিয়া সিন্ধুঘটা।

সিন্ধু পাশে পাশে　　তাহার নিকটে
আয়ল রসের ছটা ॥
প্রেমের কাছেতে　　মোহের বসতি
মোহের সমুখে লেহা।
লেহার উপরে　　এক মেওয়া আছে
তাতে এক আছে গেহা ॥
সেই সে গেহার　　এ নয় দুয়ার
তাতে হংস আছে জোড়ে !
সেই মেওয়া ফল　　সায়রে গলিয়া
কণিক কণিক পড়ে ॥
তার কণা আশে　　ডুবি সেই হংসে
চুনি চুনি খায় কণা।
সেই সে কণার　　শত গুণ লাগি
বিরিঞ্চি বাসনাপণা ॥
তিন গুণে সেই　　মেওয়ার বসতি
যে গুণ যে জন ভজে।
সেই গুণে থাকে　　মেওয়ার উপরে
যে রসে যে জন মজে ॥
রস তত্ত্বখানি　　তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাধার লেহা।
গোকুলে জনম　　তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া দেহা ॥
চণ্ডীদাস কহে　　এ রস মাধুরি
ছানিলে রসের সিন্ধু।
শুনি দেব যত　　দাণ্ডাইয়া শত
মোরা না পাইয়ে বিন্দু ॥ ২২॥

বন্ধু কাহে না পায়ল বিন্দু।
রসের সমুদ্র কাছে　　মো সভার বসতি আছে
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু ॥
তুমি কৃপালু হয়া　　দীনেহ না দিলে দয়া
কি আর কহিব রাঙ্গাপায়।
এমন পীরিতি রস　　মো সভা করিতে বশ
কবে হেন রসেতে না হয় ॥
পীরিতি সায়রে খুঁজি　　পাইলুঁ সেহেন নিধি
তাহা প্রভু নিজে কর পান।
সেই রসতত্ত্ব লাগি　　ভাবে ভক্তগণ যোগী
কারে হেন প্রীত কর দান ॥
তুমি প্রভু দয়াময়　　কহিতে লাগয়ে ভয়
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী।
যবে প্রভু জন্ম নিবে　　গোকুলে নন্দের ঘরে
গুল্ম লতা হইব সে আমি ॥
ব্রজে যাব গোচারণে　　লয়া বংশী শিশুগণে
নয়ন ভরিয়া যেন দেখি।
আর এক শুন প্রভু　　দয়া না ছাড়িহ কভু
মরমে মরমে যেন রাখি ॥
সে নব কিশোরী সনে　　রাস-রস জাগরণে
শুনি যেন নপুরের তালি।
যবে ফিরি বনে বনে　　চাহিব চরণ পানে
লাগে যেন চরণের ধূলি ॥
তথির কারণে দেবা　　পাইব চরণ সেবা
তেই মোরা লতা হৈতে আশে।
আমার বাসনা এই　　নিশ্চয় কহিয় সেই
চরণে কহিছে চণ্ডীদাসে ॥ ২৩ ॥

কহে নর্ম্মসখি　　শুন চন্দ্রমুখি
পুরুব বৃত্তান্ত কথা।
হেনক পীরিতি　　তাহা পাবে কতি
পীরিতি থাকয়ে তথা ॥
এই রূপে ভেল　　পিরিতি জনম
আখর উঠল তিন।

তোহে তাহে আছে পীরিতি ধরম
ইথে নাহি কিছু ভিন ॥
ঐছন পীরিতি তাহার ঘোষণা
রোষ না করহ রাধে ।
অনেক যতনে পীরিতি রতন
পায়াছ অনেক সাধে ॥
এত দুঃখে দেবে মথন করিয়া
পায়ল পীরিতি লেহা ।
হেনক পীরিতি বিহনে যে জন
কি ছার তাহার দেহা ॥
পীরিতি কি রীতি রসের আরতি
না জানে দোসর জনে ।
তোহে তাহে আধ আধ প্রীত ছিল
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২৪ ॥

রাই কহে শুন মরম সজনি
পীরিতে যাহার চিত ।
তবে এত দুঃখ নহে কোন সুখ
কেমন ধরল রীত ॥
পীরিতি কে জানে এমন ধরণ
প্রথমে আছিল ভাল ।
শেষে হেন করে নাহিক সংসারে
ভাবিতে পরাণ গেল ॥
কি দোষ দেখিয়া সেই হেন প্রিয়া
মধুপুর দূর দেশ ।
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় না গণল
হইল পরাণ শেষ ॥
আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে ।
তাহার কারণ পীরিতি আক্ষেপ
করিল আপন মনে ॥
তারে মিছা রোষ কার নহে দোষ
আপন করমহীন ।
যবে শুভ দশা মিলয়ে সভার
পাইবে তাহার চিহ্ন ॥
দেবে কহে হে দে দেয়াসী কহল
গণিল অনেক সাধে ।
তুরিতে আয়ব সে নব নাগর
শুনহ সুন্দরী রাধে ॥
এ কথা শুনিয়া হরষ হইয়া
কহেন একটী বাণী ।
কবে গিয়াছিলে দেয়াসীর ঘর
আমিত নাহিক জানি ॥
নন্দ রাজপুরে আছেন দেয়াসী
জানহ তাহার নাম ।
বুঝহ কি রীতি ইহার যুগতি
তুরিতে আয়ব ঠাম ॥
রাধার বচনে এক নব রামা
তুরিতে চলিয়া গেল ।
সব বিবরণ কানুর কারণ
কহিতে মোহিত ভেল ॥
শুনগো দেয়াসী কানুর প্রেয়সী
আয়লুঁ তোমার কাছে ।
বুঝহ কারণ কেমন ধরণ
যেবা তোর মনে আছে ॥
দেবী আরাধিয়া হেদে দেয়াসিনি
শিরেতে চড়াহ ফুল ।
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
বিহি হব অনুকূল ॥ ২৫ ॥

জয়শ্রী

দেবী আরাধন　　　　করল যতন
　　চড়ায়ে মাথায়ে ফুল।
কহ কহ দেবি　　　　নিশ্চয় বচন
　　যদি হবে অনুকূল॥
মথুরা নগরী　　　　দূর পরবাস
　　গেছেন নাগর হরি।
যদি বা তুরিত　　　　গমন করব
　　সে নব চতুর ধারী॥
সমুখ সমহ　　　　যদি ফুল দেহ
　　তবে সে জানব ভালি।
তবে সে জানব　　　　গোকুল নগরে
　　আয়ব সে বনমালী॥
এ সব রচন　　　　করত যতন
　　চড়ায়ে মাথায়ে ফুল।
তুরিত করিয়া　　　　হরি গৃহে আন
　　তুমি হও অনুকূল॥
দাণ্ডায়ে সমুখে　　　　সেই সে দেয়াসী
　　কর যোড়ে আছে কাছে।
তুমি দিলে বর　　　　বালিকা উপর
　　স্বস্বামী নিয়া কাছে॥
কোন অপরাধে　　　　সে হেন নাগর
　　তেজল রাধার সঙ্গ।
সুখের ঘরেতে　　　　দুঃখ অতি ভেল
　　তিলেকে হইল ভঙ্গ॥
যদি বা যায়ব　　　　গোকুল নগর
　　দেহ না মাথার ফুলে।
তবে সে জানব　　　　তোমার মহিমা
　　পূজন করিব ভালে॥
চণ্ডীদাস বলে　　　　শুন গো সজনি
　　দেবীর নাহিক দয়া।
ফুল নাহি নড়ে　　　　ভূমে নাহি পড়ে
　　বুঝিয়া বুঝল ইহা॥ ২৬॥

বল দেয়াসিনী　　　　শুনহ ভবানি
　　পড়ুক মাথার ফুল।
এই নিবেদন　　　　তোমার চরণে
　　রাইয়ে হয় অনুকূল॥
তুমি সে জানহ　　　　তোমার গোচর
　　তুমি যদি কর দয়া।
তুরিত করিয়া　　　　দেহ এক ফুল
　　না কর তিলেক মায়া॥
যদি বা কানাই　　　　তুরিতে আয়ব
　　তেজিয়া মথুরাপুর।
এ চূড়া ভাঙ্গিয়া　　　　পড়ুক আসিয়া
　　দেহ না মাথার ফুল॥
এ বোল বলিতে　　　　দিয়াসী দাণ্ডায়ে
　　যুড়িয়া এ দুই কর।
যদি বা তুরিতে　　　　মথুরা তেজিয়া
　　কানাই আসিব ঘর॥
এ বোল বলিতে　　　　গৌরী দিল ফুল
　　ভাঙ্গিয়া মাথার চূড়া।
সেই নব রামা　　　　চলিলা তুরিতে
　　অতি সে হইয়া চেরা॥ ২৭॥

সেই নব রামা　　　　তুরিত গমন
　　চলিলা রাধার পাশে।
কহিতে লাগল　　　　সব বিবরণ
　　রায়ের ও মন তুষে॥
দেবি দিল ফুল　　　　ভেল অনুকূল
　　পিয়া সে আয়ব ঘর।

এ কথা অন্যথা নহিব কখন
পাইল মনের সর ॥
পুন এক বলি শুন গো সুন্দরি
গণক ডাকিয়া আনি ।
তাহারে গণাব আপনার নামে
কি হেতু ইহার শুনি ॥
আনহ যতনে গণক ডাকিয়া
গণুক ভালই মতে ।
কোন্ দোষ আছে তার মোর রাশ্যে
বুঝিব আপন চিতে ॥
ডাকিয়া আনিল গণক আইল
সুধাই রাধার রাশি ।
পাঁজি পুথি লয়া সুযগ গণক
হরিষে গণিতে বসি ॥
রাধা নামে রাশি তোলাইয়ে আসি
কোন কোন দোষ আছে ।
এবার রাশ্যেতে গণিতে গণিতে
চণ্ডীদাস আছে কাছে ॥ ২৮ ॥

ধানসি

একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে
তৃতীয়ায়ে আছে শনি ।
বুধ বলবান দশায়ে আছয়ে
বৎসর ভালই গণি ॥
কেতু রাহু আছে অতি শুভ গ্রহ
মঙ্গল গোচর জানি ।
শুনিয়া আনন্দ ঘুচে মন ধন্দ
ভালে সে ভাবিয়া গণি ॥
এ সব গণন গণিয়া গণক
পাইল সুফল দশা ।
এ সব বচন শুনিতে রাধার
হইল আনন্দ আশা ॥
গণক তুষিয়া হরষ হইয়া
বৈঠল কিশোরী গোরী ।
করের রতন অঙ্গুরি গণকে
তুরিতে দিলেন পেলি ॥
চলিলা গণক আপন মন্দিরে
হরষ বদন হয়া ।
দেয়াসীর বোলে গণকের বাণী
এ দুই সমান পায়া ॥
পুনরপি ধনী কহে এক বাণী
শুনহ সজনি সই ।
আর এক আছে আগ উঠাইতে
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ২৯ ॥

কহিয়ে সজনি শুন এক বাণী
আনহ ধবল ধান ।
আগ উঠাইব বিচার করিব
ইহাতে নাহিক আন ॥
শুক্ল ধান আনি ভূমেতে থুয়ল
সে নব কিশোরী রাই ।
যদি গৃহে মোর কানাই আসিব
তুরিতে কহিবি তাই ॥
এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল
বিজোড় নাহিক হয় ।
জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান
বুঝিল মঙ্গল হয় ॥
চণ্ডীদাস বলে তুরিতে মিলব
কিশোর নাগর কান ।

শুতলি মন্দিরে সখিগণ রঙ্গে
সরল হইল মান ॥ ৩০ ॥

চণ্ডীদাস বলে ধৈরজ ধরহ
ক্ষেণে চিত কর থির ॥ ৩১ ॥

রাগশ্রী

সেই যে মন্দিরে শুতলি কিশোরী
কিছু হয়ে একমনে।
পুরুব পীরিতি যখন করিল
কালিয়া কানুর সনে ॥
বন্ধুর চূড়ার মাণিক পুতলি
পুরুবে পড়িয়াছিল।
সেই সে পুতলি যতন করিয়া
সমুখে রাখিয়া নিল ॥
সেই সে মাণিক পুতলি দেখিয়া
সে নব সুন্দরী রাই।
নিজ কোরে করি মান উপজল
কুরঙ্গ নয়নে চাই ॥
আপন নীলের বসন দেখিয়া
কানু পড়ি গেল মনে।
বিষম বিরহ উপজল অতি
কিছুই নাহিক মনে ॥
ধরণী উপরে পড়ল সুন্দরী
চিত্রের পুতলি হেন।
ধূলায়ে ধূসরি নবীন কিশোরী
সোনার প্রতিমা যেন ॥
লোরে ঢল ঢল বাহিয়া চলিল
সঙরি পিয়ার গুণে।
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
সে সব পড়িল মনে ॥
নয়নের জল বহে অনিবার
ভিঁজল অঙ্গের চীর।

বরাড়ি

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেক নিশ্বাস নাসা।
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা ॥
মনের হুতাশে নিশ্বাস সহিতে
নাসার বেসর খসে।
চান্দ মুখখানি মলিন হইছে
যেনক নাহিক রসে ॥
কোটি চান্দ নিছি কি তার গণনা
যাহার বদন শোভা।
চান্দের ভরমে চকোর লালসে
পাইতে সুধার লোভা ॥
সো বর বিধুর এমতি দেখিয়ে
যেমন আন্ধার লাগে।
উঠ উঠ বলি বলে কোন নারী
দেখিতে ভয় সে লাগে ॥
নিকট ভেঠব সো বর নাগর
ধৈরজ ধরহ রাধা।
সো বর কিশোরী খিন তনু ভেল
সকল করল বাধা ॥
চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
সে বর রসিক কান।
হের কমলিনী যে শুভ দেখিল
মনে না ভাবিহ আন ॥ ৩২ ॥

কেদার

রাধা তুমি জানহ কি রীতি।
বিরহ বেদনা মনে জানিবা তেজহ প্রাণে
বুঝিলাঙ হেন তার গতি॥
অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে
পুন তাহা করিল নৈরাশ।
করম লিখন যে খণ্ডাইতে পারে কে
ঘুচিল সকল সুখ আশ॥
স্ত্রী-বধ-পাতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়ে
পাসরিল এ সকল লেহা।
অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন
জনম দুখিতে গেল দেহা॥
পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল
কুলশীল গেল এত দূর।
হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান
তারে কহে দয়ার ঠাকুর॥
বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অনুচিতি
পরিণামে পরাভব সারা।
সেথানে পরের বশে কুবুজায়ে রতি রসে
ঐছন তাহার ভেল ধারা॥
মরম সখীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণি
কহে পুন তাহার উত্তর।
সে যদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল
ইহার ঘুচাব আর ঘর॥
যাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ
ঐ তনু তেজিব গিয়া জলে।
চণ্ডীদাস কহে সারা বুঝিল তাহার ধারা
পরতিত কর মোর বোলে॥ ৩৩॥

কানড়া

সো বর নাগর কান।
নিশির শয়নে দেখিল স্বপনে
সুবল আয়ল ঠাম॥
শুনহ সুবল কি আজু দেখল
সো বর রঙ্গিণী রাই।
গোকু[ল] হইতে আইলা তুরিতে
স্বপনে দেখিল যেই॥
পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
অতি সে কৌতুক-রসে।
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি
করই অনেক বেশে॥
রাইয়ের কুন্তল বনাই সুন্দর
মাথাই কুঙ্কুম গন্ধে।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
দুসারি বকুল ছান্ধে॥
মুকুতা গাঁথিয়া দুপাশে খেচনি
দিয়া মাণিকের চুনি।
কুন্তল বেনান অতি সুশোভন
যেমন দেখল ফণী॥
শিথায়ে সিন্দুর অতি বিলক্ষণ
চৌদিগে চন্দনবিন্দু।
তা দেখিয়া ব্যাসে লজ্জিত হইলা
লাখে শশধর বিন্দু॥
গলে গজমতি কিবা সে সুভাঁতি
কাঁচলি উপরে পড়ে।
সোনার কাঁচলি দুধারে মুকুতা
গাঁথি পরায়ল তারে॥
দেখ অদভুত যেমন দামিনী
চটকে অগোরের ঘটা।

নিতম্বে সোনার ঘুঘুর দিয়াছে
কি কহিব তার ছটা ॥
নীল বাস অতি উড়নি সুন্দর
ধরিয়া আপন করে।
রতন নূপুর দেয়লি সুন্দর
চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥ ৩৪ ॥

জয়শ্রী

হেন বেলা নিদ ভাঙ্গিল তুরিত
শুনহ সুবল সখা।
নিশির স্বপন না হয়ে কথন
পুন সে নাহিক দেখা ॥
দেখিতে দেখিতে কতি গেল তুখ
ভৈগেল প্রেমের লেঠা।
এই সে দেখল নিশি অবশেষে
পশিল দারুণ জাঠা ॥
কে বলে পীরিতি অতি সুখময়
তিলেক নাহিক সুখ।
ভাবিতে গুণিতে পীরিতি মুরুতি
পরিণামে এত তুখ ॥
এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনী যত।
সুবল না দেখি নিশির স্বপন
সেই ভেল অনুচিত ॥
ঐছন স্বপন দেখল ভৈগেল
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে।
উড়িয়া বৈঠল সকল নৈরাশ
কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে ॥
কোথা না দেখল সোনার নাগরী
কোথাহ সুবল মোর।
নিশির স্বপন মিছাই মগন
চণ্ডীদাস শুনি ভোর ॥ ৩৫ ॥

ভৈরবী

নিশির স্বপন দেখল যখন
বিস্মিত হইল বড়ি।
দিয়া দরশন পুন সে গমন
এ কথা বিষম বড়ি ॥
রাধার দরশ করল পরশ
অতি মগন চিত।
যেমত জলের বিম্বুক মিলায়ে
তাহার ঐছন রীত ॥
উঠি সুনাগর গুণের সাগর
চিন্তিত হইয়া রয়।
কিবা দেখি আজি নিশির স্বপন
কহিলে কি জানি হয় ॥
স্বপন গমন সত্য নহে কভু
ইহাই দেখল মনে।
নিশি অবশেষে কথার আলাপ
সুবল সাঙ্গাত সনে ॥
ঐছন কিশোরী দেখল তখন
পুন দরশন নাই।
বিস্মিত হইলা শ্যাম নটরাজ
কহব কাহার ঠাঁই ॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
বেদের বিহিত কয়।
নিশ্চয় স্বপন রাই ভাগ্য কভু
শয়ে এক সাঁচা হয় ॥ ৩৬ ॥

তথা

স্বপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায়।
অতি সচকিত হইলা বেকত
কিছুই নাহিক ভায়॥
সে বর নাগর গুণের সাগর
ভাবিতে রাধার রূপ।
বিরহ উঠল তৈখন হইল
বিষম লেঠার কুপ॥
পুরুব পীরিতি মনে পড়ি গেল
সম্বিত না লয় চিতে।
মধুর মুরুলি বদনে লইয়া
আকুল করল গীতে॥
রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা
দিয়া সে দরশ আশা।
পুন গেলা কতি রাই রসবতি
পাইলা এ ফল ভাসা॥
খেনে খেনে খেনে মুরুলির গানে
সঙ্কেত বলিয়া বাজে।
মথুরা নাগরী শুনিয়া মুরুলি
তাহারা দেখিতে সাজে॥
তা দেখি অধিক মনে পড়ি গেল
পুরুব রসের কেলি।
অধিক বিরহ তাহে উপজল
হৃদয় ভিতরে জারি॥
তাথে এক নব রামার সুঠান
তার নাম কহে রাধা।
সে কথা যখন শুনল শ্রবণে
তাথে ভেল অনুরাধা॥
বৃখভানুসুতা সে বা রহে কোথা
ঐছন উঠল চিতে।
তার না[ম] রাধা গোকুল নগরে
সে মোর পরাণ রিতে॥
সেই সে বিরহ উঠয়ে দ্বিগুণ
চিত স্থির নাহি মানে।
মুদিয়া নয়ন কাঁপয়ে বয়ান
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ৩৭॥

কর্ণাট

শুন শুন প্রাণের উদ্ধব।
হেন চিত আছে মোরা বুঝিয়ে এমতি ধারা
গোকুলেতে করহ উদ্ভব॥
লইয়া সন্দেশ হার ঝট কর আগুসার
তবে চিত স্থির করি মানে।
কহিব যতন করি তুরিতে আওব হরি
পাছে ধনী তেজয়ে পরাণে॥
সে নব কিশোরী গোরী চিতে পাসরিতে নারি
গোপতে গুমরি এই চিতে।
অবলম্ব করি তাই বাঁশীতে সুচারু গাই
রাধা নাম বলিএ বেকতে॥
সে মোর তনুর সম তা বিনু দেখয়ে ভ্রম
সে মোর ভজন তনুধারী।
বিষম কংসের মতি রাখিতে জগতে খ্যাতি
তারে বধিবারে মধুপুরী॥
ভাবিতে রাধার গুণ পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ
হিয়া বিন্ধে সোহেন নাগরী।
আমার বিরহ পায়া না জানে কি আছে জিয়া
সেই মোর নবীন নাগরী॥
লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লয়া শুভ বেলা
কহিবে বচন দুই চারি।
তুরিতে যাইয়া দেখ কি কাজ বিলম্বে থাক
যাহ ঝট গোকুল নগরী॥

শ্যামের বচন শুনি　　　উদ্ধব মনেতে গণি
শুন প্রভু মোরে কর দয়া।
দেহত সন্দেশ মাল　　　লইয়া উদ্ধব ভাল
চলি পথে গোবিন্দ ধেয়াইয়া॥
চণ্ডীদাস অতি সুখী　　　মনেতে আনন্দ দেখি
রাধার করিতে উদ্দেশ।
ধাইয়া চলল পথে　　　রাধারে বারতা দিতে
গাইতে রাধার গুণ যশ॥৩৮॥

হেনই সময়ে কাক　　　কহিতে লাগল ডাক
বসিয়া মন্দিরশির রহে।
হেন বোল আর কাক　কাহে কহে লাক ডাক
আহার বাটিয়া খায় চুহে॥
কহে কত নানা বোল　　　করে বহু উত্তরোল
বদনে বদনে করে ডাক।
দেখিযা কিশোরী গোরী　সখীরে পুছয়ে বেরি
শুভাশুভ দেখি এই বেলা॥
আচম্বিতে আসি কাক　　　কহয়ে বহুত ডাক
কি হেতু ইহার দেখি জ্ঞান।
বুঝিহ ইহার গতি　　　শুনহ যুবতী সতী
কি শবদ দেখি ইহা শুন॥
তাহা দেখি এক সখী　　হেদে কাক কহ দেখি
যদি গৃহে আয়ব কানাই।
উড়িয়া বৈঠহ ঠায　　　আসিব গতিক প্রায়
উড় দেখি বৈস এক ঠাই॥
উড়িয়া বৈঠল কাক　　　করয়ে বদন ডাক
যার গৃহে বসিলা তুরিতে।
চণ্ডীদাস কহে রাই　　　নিশ্চয় কহিয়ে এই
বুঝিলাঙ শুভাশুভ চিত্তে॥ ৩৯॥

ধানশ্রী

শুনি কাকবাণী　　　কহে বিনোদিনী
হরি কি আয়ব ঘরে।
এ ঘর হইতে　　　ও ঘর বৈঠল
বুঝিনু কাজের ছলে॥
মাথুর তেজিয়া　　　সেই বিনোদিয়া
আসিব বলিতে উড়ে।
কাক কলরব　　　আহার বাটিল
ওষ্ঠে হৈতে খসি পড়ে॥
শুভাশুভ দেখি　　　শুনহ যুবতী
মাধব আয়ব গেহা।
পুন শুভদিন　　　দেখি তার চিন
আজু সে বুঝল লেহা॥
দেখিয়া আনন্দ　　　হইল রাধার
কানাঞি আসিব ঘর।
তুরিতে আ[য়]ব　　　রসিক নাগর
মনেতে জানিল রস॥
এ সব বচন　　　করিল রচন
দুই চারি সখী মেলি।
চণ্ডীদাস বলে　　　নিকটে মিলব
মনেতে জানিল ভালি॥ ৪০॥

নটনারায়ণ

শুন গো মরমসখি তোরা।
নিশি অবশেষ কালে　　ঘুমে অচেতন ভালে
স্বপনে দেখিল চিতচোরা॥
একে নবঘনশ্যাম　　　পীত বাস অনুপাম
বান্ধে চূড়া নানা ফুল দিয়া।
হাসিয়া নাগর রায়　　　আসিয়া বৈঠল ঠায়
দুটি করে কর আরোপিয়া॥

এবে নাম বিরহিণী কহিল কঠিন বাণী
কেঁপে ছিল কর ছাড়াইয়া ।
পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি
বসাইলা যতন করিয়া ॥
শুতল চতুর হরি মোহে নিজ কোরে করি
আলিঙ্গন বেরি আচম্বিতে ।
দারুণ কোকিল নাদ মনে না পুরল সাধ
বুঝিলাঙ হইল প্রভাতে ॥
যেমন সতিনী প্রায় সঘনে ডাকয়ে রায়
মনে না পুরল কোন আশা ।
ননদিনী পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি
হেন বুঝি নিশি ভেল উষা ॥
তুরিতে রসিকরাজ রাখিয়া নপুর সাজ
বড় দুখ রহল মরমে ।
এহেন সময় কালে ভাঙ্গি সুখ অবহেলে
মিলি আখি দূর গেল ঘুমে ॥
নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই
পিয়া সনে না পারি বঞ্চিতে ।
চণ্ডীদাস বলে বাণী মিলিব নাগরমণি
হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৪১ ॥

আজু বড় মোর শুভদিন ভেল
কানুরে দেখিয়াছি ।
মথুরা হইতে আইল গৃহেতে
পিয়ারে দেখিয়াছি ॥
আজু নিজদেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা ।
নিশি ভোল অতি নিশি করি মানি
লেহা করি মানি লেহা ॥
আজু মলয়গিরি- মন্দ পবন বহু
আকাশে উদিত হউ চন্দা ।
অবহু মউরগণ নাচু সাধে করু
কোকিল কুহুহু ধন্ধা ॥
চামরু চামর ধরিয়া সুন্দর
বাধুলি হউ রূপবান ।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন জানত
তুরিতে ভেঠব তোহে কান ॥ ৪২॥

যথারাগ

সখি হে, আজু রজনি শুভ ভেলা ।
কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল
পায়ব ফল অতি ভেলা ॥
গণি গণি বচ্ছর আয়ব রে হরি
কবহু না শুভদশা ভেলি ।
ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ
মোহে দরশায়লি ভালি ॥
অমঙ্গল বিঘিনি ঘাটত পড়ু বাধক
সৌরভ তেজত গন্ধ ।
শুষ্কহি কাষ্ঠ তরুবর বৈঠত
কাক শিখির বন্ধ ॥
দিনহুঁ পড়ত কত কতহুঁ বরজপতি
দেখল দিন মাহ ।
অব নিশি রজনি ফুয়ল করি মানল
হেরহুঁ তাকর দেহ ॥
চন্দন গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত
কোকিল সুমধুর জান ।
বাম নয়ন ঘন করতহি স্পন্দন
হেরলুঁ তছু অবিধান ॥
বিপিন গহন যত আছিলহি মুদিত
সবহুঁ খিন্ন তনু মেলি ।

খঞ্জন পাখী কমল পর দেখলি
অতি তনু আনন্দ ভেলি ॥
কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
সো ভেল সরস মান।
চণ্ডীদাস কহে শুন ধনি সুন্দরি
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৪৩ ॥

এ সখি শুন মোর বোল।
হরি আজু মীললি কোল ॥
দেখহু রজনিক শেষ।
আজু সভে পূজহ মহেশ ॥
পূজহ যত দেবী দেবা।
তাকর সভে কর সেবা ॥
মঙ্গল গায়ত মেলি।
সভে মেলি দেয়ত তালি ॥
গায়ত বায়ত ঘনঘোর।
ধূপ দীপ লেহ গোচর ॥
চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই।
খণ্ড আতর কর তাই ॥
পূজহ পশুপতি দেবা।
তব ধনি করতহি সেবা ॥
মঙ্গল ঘট পরিপূর।
রাম কদলি রূপ দূর ॥
নগরে বাজাহ ভেরু জোড়।
দগড় ডিণ্ডিম ঘন ঘোর ॥
গাঁথই বনমালা জোর।
চণ্ডীদাস ভেল ভোর ॥ ৪৪ ॥

কানড়া

সখী কহে শুন ধনি রমণী[র] শিরোমণি
শুভদশা জানল এখন।
নিশির স্বপনে যদি দেখিয়াছ গুণনিধি
তব হরি আয়ব ভবন ॥
হরষ বদন ধনি কহএ কিছুই বাণী
কোকিল সতিন সম ভেল।
করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ
হাচম্বিতে ডাকিয়া উঠল ॥
ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ
হইব অক্ষটির বিনাশি।
হেনক ভাবিল মনে তবে রাখে কোন জনে
গলাএ ধরিয়া দিব ফাঁসি ॥
জতেক কোকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে
ধরিব জতেক পিকগণে।
সভারে করিয়া জড় মারিতে কর্যাছি দড়
যমুনাতে ডুবাব যতনে ॥
বিনাশ করিব তারে এ দুখ কহিব কারে
সেই ভেল রিপুর সমান।
সুখেতে করিল দুখ না হল্য মনের সুখ
শুনি রব উঠে গেল কান ॥
মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাপাশয়
দুর্ম্মতি বিষিনী কুলকাটা।
ভাঙ্গিল নয়ন নিন্দ গেলা তেজি গোবিন্দ
চণ্ডীদাস ভালে লেঠা ॥৪৫॥

রাগ তথা

পুন কি এমন দশা মোর।
পিয়া কি করব নিজ কোর ॥
আর কি ডাকব বনমালি।
পুন হব রস রাস কেলি ॥
দেবে কহে গণক গণিয়া।
স্বপনে দেখিনু আজু পিয়া ॥

তবে সে করমফল মানি।
এ কথা অন্যথা না হয় জানি॥
দেখি চণ্ডীদাস কয়।
নিকটে মিলব রসময়॥ ৪৬॥

কর্ণাট

হেনক সমএ রথ আরোহণে
আইল উদ্ধব মতি।
উদ্ধব আনন্দ মনে রসানন্দ
তাহা না কহিব কতি॥
গোকুল নগরি প্রবেশিলা আসি
গোধূলি সময় কালে।
প্রেমে গদ গদ কহে আধ আধ
কাতর হইয়া বলে॥
এক সহচরি বাহির দুয়ারে
দেখিয়া সুচারু রথ।
ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে
নাহি দেখি যেন পথ॥
আপনার অঙ্গ আপনি না চিনে
তুরিতে যাইয়া কয়।
এত দিন দুখ সুখ করি মানি
ঘরে আল্য রসময়॥
কিশোরী বিসোরি কানুর বিরহে
ভাবনা করিতেছিল।
হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিয়া
তুরিতে বাহির হল॥
রাই কহে শুন কেমন ধরন
কি হেতু ইহার শুনি।
সখি সব কথা কহিতে লাগল
সব বিবরণ বাণী॥

নিকট দুয়ারে রথ আরোহণে
আয়ল রসিক কান।
পুলকে বদনে চাহি পথি পানে
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ৪৭॥

রাগশ্রী

ধনি কহে দেখ বাহির দুয়ারে
কানু কি [আ]য়ল গেহা।
আজু সে রজনি সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা॥
গিয়া এক সখি দেখল তুরিতে
নিশিতে লখিতে নারে।
তুমি কোন জন বলহ বচন
কে বট রথের পরে॥
বিনতি আরতি অনেক প্রকারে
কাতর বচনে বলে।

*　　*　　*

কোথা না আছয়ে শ্যামের প্রেয়সি
রাধা বলি তার নাম।
তাহারে দেখিতে মোরে পাঠায়ল
সো বর নাগর শ্যাম॥
শ্যাম পরসঙ্গ শুনিতে সে ধনি
অঙ্গ পুলকিত ভেল।
মৃত তরু জেন বারি ঢাড়ি পাল্যে
সে তরু মুঞ্জরি গেল॥
পুলকে পুরল শ্যাম নাম শুনি
কহ কহ পুন বোল।
বহু দিন পর কানু নাম শুনি
তনু মুগধল মোর॥
শুনহ সুন্দরি নবীন কিশোরী
শ্রবণ পরশি পুন।

মোরে পাঠায়ল　　তোমারে দেখিতে
কি রীতি দেখিয়ে হেন ॥
কানুর আদর　　দেখিয়ে যেমন
কহিতে কহিব কতি।
অনেক প্রকারে　　প্রবন্ধ বুঝাতে
আমি সে আইলুঁ ইথি ॥
সো নব নাগর　　গুণের সাগর
তোমার বিরহে আধা।
শুইতে বসিতে　　দিগ নেহারিতে
সদাই দেখয়ে রাধা ॥
তোমার বিরহ　　কাতর দেখিয়া
তেজি পাঠায়ল মোরে।
দশমি দশার　　অবশেষ শুনি
কানু সে কাতর ভালে ॥
চণ্ডীদাস বলে　　ঐছন দেখল
সে হরি কাতর বড়।
দোহে এক তনু　　ভিনু সে ভৈগেল
বুঝিতে বিষম বড় ॥৪৮॥

কামোদ

কি নাম তোমার　　বলহ বচন
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
পুন সে সরল　　হইল গরল
সো নব কিশোরি গোরি ॥
এই সে আছিল　　অঙ্গের পুলক
শুনিয়া শ্যামের নাম।
ক্ষেণেকে ভৈগেল　　আর দশা ভেল
কি রস ইহার নাম ॥
রসের আরতি　　কি জানি পীরিতি
রসের উপরে রস।
প্রধান বসতি　　আট রস তথি
যাহাতে করিল বশ ॥
তার তর তম　　ছপ্পন্ন রসের
তিন সে আছয়ে রীত।
বিপ্রলম্ভ সনে　　এ সব আখ্যান
প্রধান করিয়া মান ॥
তবে সে বলিবে　　কলহান্তরিত
এখানে কিরূপ হয়।
গোচর নহিলে　　কিরূপে হইল
রসাভাস মাত্র হয় ॥
ব্যাসের রচন　　বেদের বচন
তাহাতে রাখহ মতি।
বৃন্দাবন তেজি　　পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি ॥
নেত্রের গোচর　　না হয়ে গোচর
গোচর দেখল যবে।
হরষ হইয়া　　বিরস বদন
বিরহ হইল তবে ॥
এ রস বুঝিতে　　আন সে নারয়ে
ব্যাসের বচন ভাষে।
বিচার করিতে　　অনেক শকতি
কোন জন বুঝে শেষে ॥ ৪৯ ॥

তুড়ি

কেবা আইসে　　দূর পর হই
না দেখি আছিনু ভাল।
তোমারে দেখিতে　　হৃদয়ে আনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল ॥
কাননে আনল　　জ্বলিলে নিভায়ে
যদি বা মেঘের লেহা।
বারি পরশনে　　দারুণ কাননে
নিভায়ে তিলেক দেহা ॥
এমতি আনল　　হিয়ায়ে পাশল
কিসেতে নিভায়ে বল।

ভস্ম আৎসাদনে তাহে ঘৃত দিয়া
অধিক করিয়া জ্বাল ॥
ধিকি ধিকি সদা অন্তর আনল
জলিছে এ রাতি দিনে।
তাহে তুমি আসি ঘৃতের আহুতি
আসিয়া দিলে বা কেনে ॥
একে বিরহিণী তাপেতে তাপিনি
ছিলাঙ তাপিত হয়া।
শ্যাম পরসঙ্গ কহিলে শ্রবণে
নিভাইব কিবা দিয়া ॥
এই তনু দেখ তাহার বিরহে
প্রতিমা আছয়ে সারা।
হৃদয় বিদারি যদি বা দেখাই
তবে হবে পাতিআরা ॥
নয়নের নীর নিশি দিশি ঝরে
সাঙন মাসের ধারা।
চণ্ডীদাস কহে নিরবধি লেহে
পরাণ তেজিবে পারা ॥ ৫০॥

কে বলে কালিয়া ভাল।
সে গুণ মহিমা ভাবিতে গুণিতে
রাধার পরাণ গেল ॥
শুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব
তাহা না কহিব কত।
বড় নিদারুণ হৃদয় কঠিন
পরাণে সহয়ে কত ॥
আমরা সে পদে এ তনু নিছিয়া
শরণ লইয়াছিলুঁ।
তাহে নিদারুণ কেবা জানে হেন
মাথায়ে কলঙ্ক নিলুঁ ॥
সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাদ
ভূষণ করিয়া নিল।
গুরু দুরুজনে দিয়া তিয়াগনে
তভু তারে নাহি পাল্য ॥
গুরুর গঞ্জনা পাড়ার তুলনা
সে নিল চন্দন চুয়া।
কি করিতে পারে ও সব বচন
কানুরে সপ্যাছি দেহা ॥
অমিয়া বলিয়া সে হরি সেবিনু
গরল হইয়া গেল।
গরল তরসি তাহার পরশি
এই গতি মতি ভেল ॥
কে জানে এমন দশার মরম
কহিতে কি জানি হয়।
চণ্ডীদাস বলে এত দুখে শুনি
জেবা করে রসময় ॥৫১॥

ভাবিতে গণিতে তাহার পীরিতি
পাঞ্জর হইল শেষ।
মরণ শরণ এই সে নিদান
প্রেমের নহিল লেশ ॥
কালার পীরিতি যে করে আরতি
সে জন মরুক জলে।
রসায়া রসায়া প্রেমসিন্ধু দিয়া
নিদান করিল লেহে ॥
কে জানে এমন না শুনি কথন
পরের পীরিতি সুখে।
ঘরতে আনিয়া ধরম খাইয়া
পরিণামে হল্য দুখে ॥
যখন করিল বহুত পীরিতি
তখনি জানিল মনে।
বহুত লেঠার বহুত আদর
সে নব কানুর সনে ॥

তখনি জানিল মনের সহিত
যে জন নিদান হবে।
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ
চণ্ডিদাস কহে ইবে॥ ৫২ ॥

তুড়ি।

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল
তিন ভাঁব তাহা নয়।
ভাবের শকতি দরশাএ কতি
অনুভাব দেখ হয়॥
আগেতে কহিল প্রেমে সে বৈচিত্র্য
ভাবনা দরশ রসে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে॥
সেই সে বৈচিত্র্য রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবিব রস।
মাথুর কারণ রস পুষ্ট লাগি
ইহাতে জগত বশ॥
রস পরিমল রসে ঢল ঢল
যার দশা আসি ভেল।
ভাবি রস কহি অনুভাবে এই
ভাবে ভাবে যতি দেল॥
এখন বিরহ অগোচর অতি
গোচর নাহিক দেখি।
অতএব হয় বিরহ দশার
সেই সে কমলমুখি॥
রসের সমুদ্র ভাবিতে ভাবিতে
অগাধ সাগর মানি।
রাঙ্গা টুনি যেন খাইবারে চাহে
মহাসমুদ্রের পানি॥

চণ্ডিদাস কহে শুন সুধামুখী
দুতমুখে শুনি বাণী।
বিষম বিরহ দূরে তেয়াগিয়া
শুনহ রমণি ধনি॥ ৫৩ ॥

করুণাশ্রী

কাহে আয়ল ওহে বিরহ দশাপর
কাহে পুছ ইহ বাণি।
উহা পরবাসি সাচি করি মানল
কুবুজা সে তাহি মন মানি॥
যো রূপি অঙ্কুরি আপনি পরশি কর
যবে ভেল অঙ্কুব শাখা।
বিরহকি তাপে জারল সো তরুবর
কি তাহে দেয়ত দেখা॥
কো জানে এ রস পরিণাম বৈভব
তব তাহা করত বেভার।
প্রেম পরশ প্রতি কর তথি দুর্গতি
কাহে পিরিতি রস হার॥
অব হাম জানল তার চিত বেবহার
তাহাকে পরিহার মান।
বিষম হুতাশ ভাষ তহুঁ দেখনি
চণ্ডিদাস গুণ গান॥ ৫৪ ॥

রাগশ্রী

এ সব বচন শুনিয়া উদ্ধব
চিন্তিত হইলা মনে।
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি
কেহো না জানয়ে প্রেমে॥
কাষ্ঠের পুতলি যেমন থাকয়ে
না স্ফুরে বচন শ্বাস।

ভকতি কি রীতি দেখিয়া উদ্ধব
কহেন একটী ভাষ ॥
শুন সুধামুখি শুনি ভেল দুখি
নহেত এমনি কাজ।
এহেন পিরিতি এড়িয়া যুবতি
গেছেন রসিকরাজ ॥
চিত কর স্থির শুনহ সুন্দরি
তেজহ দারুণ মতি।
হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে
বুঝিয়ে হেনক গতি ॥
তেজিয়াছ সুখ শ্রীমুখমণ্ডল
দেখিয়ে আন্ধার সম!
বচন কহিতে নাহিক শকতি
ক্ষণেকে হইছ ভ্রম ॥
কোটি চান্দ জিনি যাউক নিছনি
ও মুখমণ্ডল আভা।
সো বিধুমণ্ডল মলিন হয়াছে
চকোর করিতে লোভা ॥
চণ্ডিদাস কহে বিরহের মোহে
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ।
অলপ বয়সে এহেন বিরহে
ততক্ষণে রহে রঙ্গ ॥ ৫৫ ॥

সুই সিন্ধুড়া

তেজিয়া এমন নাগরির কোর
মথুরা রহল গিয়া।
* * *
কালিয়া বরণ যিসের কারণ
তাহাত ভালই জানি।
তেকারণে তিহো কালিয়া হইল
শুনহ পুরুব বাণী ॥
যে কালে সমুদ্র মথন করিল
অমৃত পাবার তরে।
দেবগণ যত হই এক যূথ
সমুদ্র মথন করে ॥
মথিতে মথিতে প্রথমে উঠল
কমলা নামেতে রামা।
তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি
অতি সে রূপের ধামা ॥
তবে সে মথনে উঠল যতনে
কালকূট বিষরাশি।
* * *
তাহাই ভক্ষয়ে নীলকণ্ঠ নাম
মহাদেব হল সুখী।
রাখিল দেবের প্রতিজ্ঞা কারণ
অসুর নাশিল ভূখি ॥
চণ্ডিদাস কহে অদ্ভুত কথা
শুনিতে শুনিবে কত।
ব্যাসের রচন পুরাণ বচন
কহিল তাহার মত ॥ ৫৬ ॥

ধানশ্রী

যেখানে আছিল কালকূট বিষ
সেওহ মাঝার কাছে।
সেই সিন্ধুসুতা বিষের সমূহে
করিয়া আছিল বাসে ॥
ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজিল
তাহার কায়ার কা।
সেই সিন্ধুসুতা তাহারে পরশি
তাহার অক্ষর কা ॥
লাবণ্য সায়রে নাহিল যখন
তখন রঞ্জিত গা।

কালের কাটিল লাবণ্যের বল
তাহাতে অঙ্গের প্রভা ॥
এ দুই আখর শুন।
ইহাতে কালিমা বরণ হইল
ইহাতে দুরিত হেন ॥
খখন কখন লাবণ্য লহরি
তখনি অমিয়া কহে।
কালকূট সবে তাহার আকৃতে
কুটিল হইয়া রহে ॥
কাল নাম দুটি আখর বলিয়া
কখন ভালই নহে।
কখন সরল কখন গরল
চণ্ডিদাস ইহা কহে ॥ ৫৭ ॥

—

মানব

কি আর বলহ শ্যামের বচন
তাহারি পিরিতি জানি।
বসায়া বসায়া পিরিতি করিয়া
পরাণে লইল টানি ॥
বিরহ সায়রে এড়িয়া নাগরে
বরাত মদন বাতি।
কানু মধুপুর সদা মন ঝুরে
নাহি জানি দিবারাতি ॥
সে জন সঙরি নিশি দিশি বারি
নয়ন পুড়িয়া বহে।
আন কিবা জানে আনের সে বেথা
কহিলে কি জানি হয়ে ॥
যে জানে যাহার মরম সরম
তাহারে এ সব দিল।
সরম ঢাকিতে আর কে আছয়ে
তারে সে দিলাঙ কুল ॥
সে হেন সরল দেশে না রাখিলা
নিদানে এমতি ধারা।
চণ্ডিদাস বলে শুন রসময়ি
পরাণ হারাবে পারা ॥ ৫৮ ॥

—

বেহাগড়া।

এ ঘর দুয়ার যেন লাগে বিষ
তাহার লাগিয়া কই।
রাতি দিন লোরে আখি না চলয়ে
হরি হরি করি রোই ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
সদাই সে গুণ গাই।
আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে
তোমারে কহিল এই ॥
যদি বা কখন সাধু প্রয়োজন
ঘুমেতে নয়ন টল।
স্বপনে সদাই বরণে লেখিয়ে
নিরবধি দেখি কাল ॥
বড় নিদারুণ অতি নিকরুণ
তিলেক নাহিক দয়া।
অবলা বধিতে আক্ষের পলকে
পরাণে কটাক্ষ দিয়া ॥
অলপ ইঙ্গিতে সভারে তেজন
তিলেক নহিল দয়া।
সকল ছাড়িয়া ও রাঙ্গা চরণে
লয়াছিনু পদছায়া ॥
চণ্ডিদাস মনে শুনিয়া বেথিত
পুলক মানল তনু।
মথুরা তেজিল সভারে কহিল
তুরিতে আযব কানু ॥ ৫৯ ॥

—

যথারাগ।

আগে কহিয়াছি পুরাণ কথন
যেমত হইল কালা।
আর কহি শুন পুরাণ কথন
ঐছন ব্যাসের ধারা॥
আন অবতারে চারি বর্ণরূপ
হইল গোলোকপতি।
রক্ত বর্ণ তুহুঁ লইয়া আকার
রাখল জগত খ্যাতি॥
তথা তার পর হইলা সুন্দর
এ পীত বরণ কায়া।
সৃষ্টির পালন আন আন বহে
করল অনেক মায়া॥
তার পর পহুঁ গোলোক ঈশ্বর
শুকল রূপ ধরি।
সৃষ্টির পালক করল দমন
অসুর দাহিল হরি॥
এবে কৃষ্ণরূপ হয়া বাঁশী ধর
করল অনেক খেলা।
গোপ গোপী যত করিল অনাথ
তেজিয়া মাথুর গেলা॥
যবে নন্দঘরে জনম লভিল
রাখল যখন * * *।
শুন্যাছি আমরা জ্ঞানীর মুখে
গর্গ মুনি অবিধান॥
চণ্ডিদাস অতি বেথিত দেখিয়া
কহেন একটি বাণী।
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া
ঘরে আল্য গুণমণি॥ ৬০॥

জয়শ্রী।

অতি সে পিরিতি যে করে যুবতি
পরের পিরিতে চিত।
জনম তাহার ভাবিতে গণিতে
পরিণামে এই রিত॥
শুনহ উদ্ধব আমার এ দশা
তাহারে কহিব কি।
কি বলিব কারে আপন বেদন
হইয়া কুলের ঝি॥
দিয়া প্রেমরাশি কত মধু ঢারি
সিঞ্চিয়া করল শাখা।
ডালে মূলে কাটি পেলাএল দূরে
পুনই সে না পাইল দেখা॥
কেমন ধরল কোন বেবহার
এহেন সুজন কাজ।
পরিণামে এই পথেরে ডারল
কুলে শীলে দিলে বাজ॥
পরের পিরিতি স্বপন সমান
জলের বিম্বুক ছায়া।
ক্ষেণেক যখন নাহি দরশন
কতি গেলা দেখা দিয়া॥
ঐছন কালার প্রেম সে পিরিতি
নাহি পরতিত তায়।
ঐছন কানুর পিরিতের লেহা
দীন চণ্ডিদাস কয়॥ ৬১॥

করুণাশ্রী

তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ ধনি।
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা
পরাণে লইল টানি॥

সভে বলে তারে রসিক নাগর
বাখানে সকল জনে।
উপরে কালিয়া বরণ দেখহ
হৃদয়ে কুটিল হানে॥
পর নহে কভু আপন বলিতে
আপনা না হয়ে পর।
বুঝহ কারণ জানল অন্তরে
কেবল বিষের ঘর॥
আন বিষ যদি কর‌য়ে ভোজন
তখনি মরিয়া যায়।
এ বিষ এড়িয়া হৃদয় মাঝারে
জ্বালিল মুরতি কায়॥
কাল সম ফণী দংশল মরমে
আর কি জীবন রয়।
না শুনে মন্তর অন্ত করি জানে
চণ্ডিদাস ইহা কয়॥ ৬২॥

কহ কহ দেখি কেমন মথুরা
কেমন নগর দেশ।
কহ দেখি শুনি কহেন সে ধনি
হইয়া কাতর শেষ॥
নগরের যত রমণী সকলি
কেমন রূপের ছটা।
কোন রসবতি করিয়া পিরীতি
ভুলায়ে করিয়া লেঠা॥
কানু কি ভুলল কুব্জা সহিতে
এই সে তাহার রীত।
তেজিয়া চন্দন ভূষণ কেসাই
এই সে তাহার চিত॥
তেজিয়া কাঞ্চন গুঞ্জা ফল সম
এ দুই একই মূল।
কোথা গজমতি কোথা সে সমান
ভেলি সে মুকতা তুল॥
কাহা মুনি সুত কাহা সে খোজল
কাচক রতনকু মান।
কাঁহা মরকত কোথা সে ফাটিক
চণ্ডিদাস পরমাণ॥ ৬৩॥

বরাড়ি।

কতি সে কোকিল বায়স ভাখত
মউর কপোত মেলি।
কাহা সে কুরঙ্গ খর সম ভেল
এ অতি লাগয়ে গালি॥
কোথা হংসরাজ কোথা সে মণ্ডুক
এ দুই সমান নয়।
তেজি গন্ধ অতি কুড়চিয়া অতি
কেবল সে রসময়॥
রসের সমূহ তেজিয়া চন্দন
কুবুজা মনেতে ভায়।
সে অতি রসিক জানল হৃদয়
চণ্ডিদাস গুণ গায়॥ ৬৪॥

এক করে ধরি রোপল অঙ্কুর
না পাই মেঘের বারি।
তাহে রবি তাপ তাপিত হইয়া
সে তনু করল জারি॥
কেমনে বাঁচব বারি না পাইয়া
তরু ভেল খিন দেহা।
তেন মত ভেল কানুর পিরীতি
আদর পিরীতি লেহা॥
কে বলে সরল তাহার হৃদয়
কুটিল বিষের রাশি।

এ দেহ তেজিব তাহার লাগিয়া
হেনক আমরা বাসি ॥
যাহার কারণে এত পরমাদ
সে ভেল নিঠুরপনা।
এমন না জানি কখন না শুনি
এত দিনে গেল জানা ॥
একে সে যুবাত সে নব ভকতি
দেখিতে না পায়ল তায়।
পিরীতি তেজিয়া গেলা কোন দেশে
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৬৫ ॥

কানু সে নিদান করল যখন
তখনি জানল মনে।
আর কি রমণী কুলের কামিনী
তার কি থাকয়ে প্রাণে ॥
এক তিল যদি বিচ্ছেদ যা সনে
তিলে কত বার মরি।
দেখিলে জুড়াই শ্রীমুখমণ্ডল
তবে সে চেতন ধরি ॥
এক শত কোটি কোটির নিমিখে
তার শত শত গুণে।
তার লাখ গুণ কণা অংশ হয়
ঐছন বেদন মনে ॥
তবে ধরি জিউ না থাকে কায়েতে
ঐছন বিচ্ছেদ ভয়।
হেন জন তেজি চলে মধুপুরি
কেমতে পরাণ রয় ॥
তবে বল যদি এমন যা সনে
তিলে না দেখিলে মর।
সে জন আঁখের আড় হই গেল
কেমতে পরাণ ধর ॥
তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি
তার তর তম বলি।
এ কথা কহিতে অনেক যতন
চণ্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৬৬ ॥

আগে আছে আর আর কহি শুন
তিনের কাছেতে তিন।
তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি
তিন তিন ভেল ক্ষিন ॥
তিন গুণ করে তিনের সমূহ
তিন তিন করি আছি।
তিন তিন তিন আনিয়া যতন
সেই সে ভাবিয়াছি ॥
তিন তিন ভয় তিন তিন লয়
তিন তিন যবে ভেলি।
তিন তিন তিন তিন সে আখর
তিন ভেল পর মেলি ॥
তিন তিন আনি হয় পরকাশি
এ তিন তিনহি নয়।
তিন গুণ যার হৃদয় উপর
তার গুণ আতিশয় ॥
কালার এ গুণ গুণের সাইতে
তার সেজে রহে সারা।
কালার কোটেক তাহার পুটেক
ঐছন তাহার ধারা ॥
আট নয় ছয় রাম রাম করি
এ কুল আখর সাধে।
তাহে গুণাগুণ তিন রসপরি
তাহে গুণ করি বাধে ॥
সে গুণে বা কুল তিন তিন করি
তিন করি ছোড়ল পাশ।

তিন তিন তিন　　তাহে ভেল চিত　　এই সে আশের আশ।
　　তাহাতে আছয়ে আশ ॥　　চরণে পড়িয়া
তেঞি সে এ জিউ　　আছিএ ধরিয়া

[১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ পাঠ সন্নিবিষ্ট হইবে]

২২৩	পৃষ্ঠার	১ম পঙ্‌ক্তি—	"শুনিল শ্রবণে"
"	"	৭ম ,,—	ব্যাস মুনিবর তায়
"	"	৮ম ,,—	পুরাণ বর্ণিল
"	"	১৩শ ,,—	সেই কল্পতরু রচিলা পুরাণ
২২৪	"	২০শ ,,—	দেবের গোচরে তথি
"	"	২৪শ ,,—	মুখে করি ল'য়া
"	"	২৮শ ,,—	ফলের লাগিয়া
,,	"	২য় ,.—	(২য় কলম)—পেলিলে কতি
,,	"	৩য় ,,—	অনেক রতন
,,	,,	৬ষ্ঠ ,,—	উড়িয়া যাইতে তেজে
,,	"	১০ম ,,—	ফলেব কারণে ঝুরে
,,	"	১৪শ ,,—	হ'য়া এক ভিত

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

জৈন-দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

(১)

ধর্ম্ম

সাধারণতঃ ধর্ম্মশব্দে পুণ্যকর্ম্ম অথবা পুণ্যকর্ম্মসমষ্টি বুঝায়। ভারতীয় বেদমার্গানুযায়ী দর্শনসমূহের কোথাও কোথাও ধর্ম্মশব্দে নৈতিক-অতিরিক্ত অর্থের আরোপ দেখা যায়। এই সমস্ত স্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বস্তুর "প্রকৃতি", "স্বভাব" বা "গুণ"। বৌদ্ধ দর্শনেও ধর্ম্মশব্দের নৈতিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু অনেক স্থলে "কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলা", "অনিত্যতা" প্রভৃতি কোন জাগতিক নিয়ম অথবা বস্তু-ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জৈনদর্শন ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে, ধর্ম্ম একটী অজীব পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

নৈতিক অর্থ ব্যতীত একটী অপরূপ অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ, একমাত্র জৈনদর্শনেই দেখা যায়। জৈনদর্শনে ধর্ম্ম একটী "অজীব" পদার্থ। কাল, অধর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় ধর্ম্ম "অমূর্ত্ত" দ্রব্য। ইহা লোকাকাশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহার "প্রদেশ"সমূহ অসংখ্যেয়। পঞ্চ "অস্তি-কায়ে"র মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম। ইহা "অপৌদ্‌গলিক" (immaterial) এবং "নিত্য"; ধর্ম্ম-পদার্থ সম্পূর্ণরূপে "নিষ্ক্রিয়" এবং "অলোকে" ইহার অস্তিত্ব নাই।

জৈন-দর্শনে ধর্ম্ম "গতি-কারণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, ধর্ম্ম বস্তু-সমূহকে চালাইয়া থাকে। ধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় পদার্থ। তাহা হইলে ইহা কিরূপে গতি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? ধর্ম্ম কোনও পদার্থের গতিবিষয়ে "বহিরঙ্গ-হেতু" বা "উদাসীন-হেতু"; ইহা পদার্থের গতির সহায়তা করে মাত্র। জীব অথবা কোনও অনাত্ম-দ্রব্য আপনা হইতেই গতিমান্ হইয়া থাকে; ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অথবা প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহাদিগকে চালিত করে না; তবে ধর্ম্ম গতির সহায়ক এবং ধর্ম্মের জন্য পদার্থের গতি এক হিসাবে সম্ভবপর হইয়া থাকে। দ্রব্য-সংগ্রহকার বলেন,—"জল যেরূপ গতিমান্ মৎস্যের গতিবিষয়ে সহায়ক, সেইরূপ ধর্ম্ম গতিমান্ জীব অথবা অনাত্মদ্রব্যের গতিবিষয়ে সহায়ক; ইহা গতিহীন পদার্থকে চালিত করে না।" কুন্দকুন্দাচার্য্য ও অন্যান্য জৈন দার্শনিকগণও এ বিষয়ে জল ও গতিশীল মৎস্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। "জল যেরূপ গতিশীল মৎস্যের গমনবিষয়ে সহায়তা করে, ধর্ম্মও সেইরূপ জীব ও পুদ্‌গলের গতির সহায়তা করে (৯২, পঞ্চাস্তিকায়সময়সারঃ)।" তত্ত্বার্থসারেরও গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"যে সমস্ত পদার্থ আপনা হইতে গতিমান্ হয়, ধর্ম্ম তাহাদের গতিবিষয়ে সহায়তা করে; গমনকালে মৎস্য যেমন জলের সাহায্য গ্রহণ করে, জীব ও অনাত্মদ্রব্যসমূহও সেইরূপ গতিবিষয়ে ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।" বস্তুসমূহের গতিবিধানে ধর্ম্মের অমুখ্যহেতুত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব ব্রহ্মদেব নিম্নোক্ত প্রকারে দৃষ্টান্ত সহকারে